মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-মূল্যায়ন

নারায়ণ চৌধুরী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৬০



প্রকাশক :
মনীষী বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
প্রশান্ত কুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

নিবেদন

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-মূল্যায়ন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। এতে আমার বিভিন্ন সময়ে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কিত নিবন্ধ ও বিশেষভাবে এ বইয়েরই জন্য রচিত একাধিক প্রবন্ধ একত্র সংযোজিত করে তাদের গ্রন্থের আকার দেওয়া হলো।

সচেতন পাঠক লক্ষ্য করবেন মানিক-সাহিত্যের মূল্যায়নের প্রশ্নে সমালোচকদের মধ্যে সচরাচর প্রচলিত মতামতকে এ বইয়ে তেমন আমল দেওয়া হয়নি। বরং সেগুলির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। কল্লোল 'যুগের ঐতিহ্যবাহী ফ্রয়েডবাদের কমবেশী প্রভাবে রচিত গল্পোপন্যাসগুলির তুলনায় উত্তর পর্বের রচনাদিতে যে মানিক সমধিক শিল্প-সার্থকতার সন্ধান পেয়েছিলেন, সে-কথাটা নানা যুক্তি ও উদাহরণ প্রয়োগে এ বইতে প্রতিপাদন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। যুক্তিসমূহ বইয়ের পাঠের ধারার মধ্যে ক্রমবিস্তারিত, এখানে আর তার আভাস না-ই বা দিলুম। তবে সূত্রাকারে এইমাত্র বলা যায়, এ বইয়ের আলোচনায় শিল্পীর ব্যক্তিগত আত্মলীনতা তথা অন্তর্নিবেশ প্রবণতার সংস্কার অপেক্ষা সঙ্ঘবদ্ধ সমষ্টি-চেতনাকে অনেক বেশী মূল্যবান মনে করা হয়েছে এবং সেইভাবেই মানিক-সাহিত্যের বিচার করা হয়েছে। শিল্পীর বহির্মুখ দৃষ্টি এখানে অন্তর্মুখ দৃষ্টির তুলনায় গরীয়সীরূপে অঙ্কিত।

পরিশিষ্ট ভাগে আমার একটি পুরনো লেখা সন্নিবেশ করা হয়েছে। সেটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। ওই প্রবন্ধে ব্যক্ত অভিমত আর আমার এখনকার অভিমতের মধ্যে পাঠক অনেক ফারাক দেখতে পাবেন। কিন্তু কোন লেখকেরই চিন্তা এক জায়গায় স্থিতু হয়ে থাকে না, তার ক্রমাগত বিবর্তন হতেই থাকে। এতে সংকোচ বোধ করবার কারণ নেই, কেননা মানুষের জীবন ক্রমপরিবর্তনশীল। পুরাতন রচনাটি এখানে সংরক্ষিত করা হলো এই ভেবে যে, এতে মদীয় চিন্তার বিবর্তনের ছকটি বোঝা যাবে, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের স্বরূপটি অনুধাবন করা সহজতর হবে। সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ থেকে এর বোধহয় একটা দলিলগত মূল্য আছে।

পাঠকের মনে হতে পারে কোন কোন জায়গায় পুনরুক্তি আছে। সেটা ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়েছে। কোন একটা বক্তব্যকে জোরালো রূপে প্রতিষ্ঠা

করতে গেলে একই কথার উপর বারংবার জোর দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। পুনরুক্তি দোষের ঝুঁকি নিয়েই তেমনটা করতে হয়। তবু যদি সহৃদয় পাঠকদের মধ্যে কারও মনে হয় ওই পুনরাবৃত্তি কিছু পরিমাণে পরিহর্তব্য ছিল, তাঁর আশ্রয় ও প্রশ্রয়ের উপরেই লেখকের ভরসা।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার পালা।

এই বইয়ের পরিশিষ্টভাগে সন্নিবিষ্ট জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে ও অন্যান্য কিছু-কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে বাংলা ভাষায় মানিক-সাহিত্যালোচনার পথিকৃৎ বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত সরোজমোহন মিত্রের বই থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থটির প্রকাশে বেঙ্গল পাবলিশার্সের বর্তমান পরিচালকদ্বয় শ্রীযুক্ত মনীষী বসু ও শ্রীযুক্ত ময়ূখ বসু প্রভূত যত্ন নিয়েছেন। তাঁরা আমার বিশেষ প্রীতিভাজন ও আত্মীয়তুল্য। এই সুযোগে তাঁদের আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

মানিক সাহিত্যের প্রচারে এবং ওই সম্পর্কিত কৌতূহল ও অনুরাগের ব্যাপ্তিতে বর্তমান গ্রন্থখানা যদি কিছু পরিমাণেও সহায়তা করতে পারে তো শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

নারায়ণ চৌধুরী

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী কথাশিল্পী মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সাহিত্যের দুটি সুস্পষ্ট ভাগ। প্রথম ভাগে পড়ে তাঁর ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ-সমন্বিত গল্প-উপন্যাস, যার বেশীর ভাগ তিরিশের দশকের গোটা পরিধি জুড়ে বিস্তৃত। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে তাঁর মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা আশ্রয়ী গল্প-উপন্যাস, যার রচনাকাল চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুকাল (১৯৫৬) পর্যন্ত বিস্তৃত। ঠিক ঠিক সময়ের হিসাবে মার্কসবাদী প্রত্যয়ে তাঁর আনুষ্ঠানিক দীক্ষা ১৯৪৪ সালে, তবে চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই যে তাঁর মন এই জাতীয় ভাব-ভাবনার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল তার প্রথম সুনিশ্চিত প্রমাণ মেলে সহরতলী উপন্যাস দুই খণ্ডের মধ্যে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে. দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪১ সালে। এই উপন্যাসই প্রথম সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়ে গেল মানিক আর নিছক যৌনতার চিত্রণে বিশ্বাসী নন, তাঁর চিন্তায় চেতনায় অর্থনৈতিক বাস্তবতার দিকটা খুবই বড় হয়ে উঠেছে। এর পর ধীরে ধীরে ব্যক্তির নির্জ্জান মনের যৌন রহস্যের ব্যবচ্ছেদ-বিশ্লেষণের অভ্যাস থেকে তাঁর শিলদৃষ্টি ক্রমশঃ সরে এসে সমষ্টিবদ্ধ মানুষের জীবনসংগ্রামের সমস্যার উপরে স্থাপিত হয় এবং সেই থেকে তিনি কমবেশী বহির্মুখ হয়ে ওঠেন।

মানিক সাহিত্যের এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক অন্তর্মুখিনতা থেকে ক্রমশঃ সামূহিক বহির্মুখিনতার অভিমুখে বিবর্তন বা পরিবর্তনকে অনেকে সমালোচনা করেন এই বলে যে, এতে তাঁর লেখার শিল্পগুণের হানি হয়েছে, তাতে কমবেশী স্থূলত্বের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। (প্রথম ভাগের লেখা দিবারাত্রির কাব্য কিংবা পুতুলনাচের ইতিকথা কিংবা পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাস তিনটিতে অথবা প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, বিসর্পিল প্রভৃতি গল্পে যৌন বাসনা-কামনার আলো-ছায়ার কুয়াশাঘেরা জটিলতা-সমন্বিত ব্যক্তিক জীবনের যে অনবদ্য শিল্পোৎকর্ষ-মণ্ডিত ছবি পাওয়া যায়, চল্লিশ দশকের পর্বভাগ থেকে রচিত তাঁর গল্পোপন্যাস-গুলিতে আর তেমনটি পাওয়া যাবে না।) ওইসব লেখায় সমাজের যৌথ মানুষের বাঁচার লড়াইয়ের কথা আছে বটে, কিন্তু ওই কথা যেন বড্ড মোটা দাগের কথা, তার ভিতর শিল্পরসের তেমন দ্যোতনা নেই। কি সহরতলী, কি দর্পণ, কি চিহ্ন, কি স্বাধীনতার স্বাদ, কি সোনার চেয়ে দামী, কি সার্বজনীন সর্বত্র যেন রচনার রীতিতে স্থূল হস্তাবলেপের চিহ্ন। মানুষের সামাজিক-মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের ছবি আঁকতে গিয়ে মানিক যেন তাঁর আগেকার

সেই ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত রহস্যসন্ধানী মিস্টিক দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন।

এদিকে গল্পগুলিতে অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ছবি আছে বটে, কিন্তু ব্যক্তির নির্জ্জান মনের অন্ধকারে লুকিয়ে-থাকা সুতীব্র যৌনতার আলোড়নের চিত্র সেখানে কোথায়? এই পর্বে মানিক ফ্রয়েডকে নির্বাসন দিয়ে মার্কসকে তাঁর লেখায় আবাহন করে এনেছেন ঠিক কথা, কিন্তু ফ্রয়েডকে নির্বাসন দিতে গিয়ে সেই সঙ্গে তিনি কি শিল্পের শক্তিকেও তাঁর সাহিত্যের জগৎ থেকে কমবেশী নির্বাসন দেন নি? দিবারাত্রির কাব্য কিংবা পুতুলনাচের ইতিকথায় যে অপূর্ব শিল্পস্বাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা কি সহরতলী, দর্পণ, চিহ্ন কিংবা সোনার চেয়ে দামী উপন্যাসে লভ্য?

অথবা প্রথম বয়সের ছোটগল্পগুলিতে মানুষের প্রসুপ্ত কামনা-বাসনাকে কেন্দ্র করে মনস্তত্ত্বের যে সূক্ষ্ম আলো-আঁধারির লীলা প্রত্যক্ষ করা যায়, উত্তর জীবনের গল্পের ছকে ধরা যাক, হারানের নাতজামাই, মাশিপিসি, টীচার, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, পেটব্যথা প্রভৃতি রচনায় কি তেমন সূক্ষ্মতার দেখা মেলে? সামাজিক মানুষের সম্মিলিত বাঁচার সংগ্রামের ছবি আঁকাটাই তো সব নয়, দেখতে হবে তা যথেষ্ট শিল্পকুশলতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে কিনা। এই মানদণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের গল্পের সঙ্গে কি দ্বিতীয় অধ্যায়ের গল্পের তুলনা হয়?

এর উত্তরে বলব, আমার পক্ষপাত স্পষ্টতই শেষের অধ্যায়ের গল্পোপন্যাস-গুলির দিকে। হতে পারে মানিকের শেষ বয়সের লেখায় দিবারাত্রির কাব্য বা পুতুলনাচেব ইতিকথা উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম চাতুরালি নেই অথবা অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প, প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী, সরীসৃপ প্রভৃতি গল্পগ্রন্থগুলিতে সংকলিত গল্পগুলির অন্তর্ভেদী শিল্পদৃষ্টির সঙ্গে তাঁর আজকাল পরশুর গল্প, পরিস্থিতি, খতিয়ান, ছোট বড়, মাটির মাশুল, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি উত্তরকালীন গল্পগ্রন্থগুলির সংকলিত গল্পগুলির শিল্পদৃষ্টি, সূক্ষ্মতা ও গভীরতার বিচারে তুলনীয় নয়। কিন্তু শিল্পের ভালমন্দের বিচার প্রায়শঃ কে কেমন দৃষ্টিতে সেই শিল্পের বিচার করবেন তার উপরে নির্ভর করে। দৃষ্টিকোণের তারতম্যে শিল্পের শিল্পগুণেরও তারতম্য।

এ কথা অবশ্য ঠিক যে, পুতুলনাচের ইতিকথার মত শিল্পরসান্বিত উপন্যাস মানিক পরে আর একটিও লেখেননি, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে তাঁর শেষের উপন্যাসগুলির সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে কি ওই উপন্যাসে প্রতিফলিত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার কোন তুলনা হয়? কুসুম আর শশীর পারস্পরিক

দুর্জ্জের আকর্ষণের চিত্র কিম্বা মতি আর কুমুদের অস্বাভাবিক দাম্পত্য প্রণয়ের কাহিনীর অদ্ভুতত্বের কী বা মূল্য যদি সেগুলিকে মানুষের তীব্র সমষ্টিগত বাঁচার লড়াইয়ের আকৃতির পাশে ফেলে বিচার করা যায়? বহুজনের সম্মানের সঙ্গে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য অধিকার আদায়ের চেষ্টাটা বড়, না, একজোড়া নরনারীর দেহকেন্দ্রিক মন-দেওয়া-নেওয়ার ঘটনার চিত্রণটা বড়? শেষোক্ত চিত্রায়ণের প্রক্রিয়ায় যতই সূক্ষ্মতার লীলা কিংবা আত্মলীনতার সৌন্দর্য প্রদর্শিত হোক-না কেন, তা কি গণমানুষের সঙ্ঘবদ্ধ বাঁচার প্রয়াসের সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারে? কল্যাণকে বাদ দিয়ে সুন্দর নয়, সামাজিক ন্যায়কে ক্ষুণ্ণ করে একজোড়া নরনারীর (তাও আবার শশী-কুসুমের বেলায় পরপুরুষ-পরস্ত্রী সম্পর্ক) ভালবাসার খুনসুটিতে মেতে ওঠার কোন কথাই উঠতে পারে না। সমাজের নির্যাতিত-শোষিত স্তরের অগণিত মানুষের—কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের—ন্যায়সংগত অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বৈধ আন্দোলনের পাশে নিতান্ত ক্ষুদ্র-খিন্ন-গণ্ডীবদ্ধ এক প্রণয়ীযুগলের অবৈধ আকর্ষণের লীলার কোন প্রতিতুলনা চলে না।

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের প্রেমচিত্রণও অতিশয় জটিল-কুটিল ও অস্বাভাবিক। কিশোরী আনন্দের প্রতি হেরম্বর দেহজ আকর্ষণের কোন নীতিগত ভিত্তি তো নেই-ই, এমনকি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তিও নেই। কেননা হেরম্ব তার মা মালতীর প্রতিও আসক্ত, যে মালতী কিনা পরস্ত্রী। এইখানে একবার সামাজিক নীতিবোধকে লঙ্ঘন করা হয়েছে, আর একবার নীতিবোধকে বিপর্যস্ত করা হযেছে একই কালে মা ও মেয়ের প্রতি আসক্তির প্রবলতা দেখিয়ে। এমনতর 'মর্বিড' দ্বৈত কামের কুটৈষণার ছবি ফুটিয়ে তুলে মানিক এই উপন্যাসে হয়ত ফ্রয়েডকে কুর্নিশ জানিয়েছেন, কিন্তু বাঙালী সমাজের পারিবারিক নীতির শুচিতাকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত করেছেন। শিল্পসৌন্দর্যের খাতিরেও এমনভাবে শিবের অপমান করতে নেই। তাতে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ ক্ষুণ্ণ হয়, নীতিহীনতা প্রশ্রয় পায়।

আমার এই মন্তব্যকে দয়া করে কেউ যেন সংকীর্ণ নীতিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করেন। এর বৃহত্তর তাৎপর্যটি যেন অনুধাবন করবার চেষ্টা করেন। মানুষের জীবন শিল্পের চেয়ে অনেক বড়। শিল্প জীবনের একটা অংশ মাত্র। জীবনের নীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে শিল্পের জটিলতা-কুটিলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এমনকি ফ্রয়েডের দোহাই পেড়েও নয়। কেননা ফ্রয়েডবাদ আসলে একটি অপবিজ্ঞান। এবং যেহেতু অপবিজ্ঞান, সেইহেতু

সাহিত্যে অপসংস্কৃতির একটি মূল কারক। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের অজুহাতে কত যে অসিদ্ধ বস্তু সাহিত্যে সিদ্ধ বস্তু বলে চলে আসছে তার ইয়ত্তা নেই।

মানিক এই ফ্রয়েডীয় আবেশে বহুদিন আচ্ছন্ন ছিলেন, যা তাঁর সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল। এই আবেশ যত-না তাঁর নিজের ভিতর থেকে সৃষ্ট তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ফল। তদানীন্তন কালীন কল্লোলীয় লেখকদের দৃষ্টান্ত এই ক্ষেত্রে মানিকের উপর অবাঞ্ছনীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল এমনতর মনে করার কারণ আছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তখন মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে চালু মুদ্রা। কল্লোল পত্রিকার লেখকেরা জেনে শুনেই এর কুহকের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। মানিক ঠিক কল্লোল যুগের মানস-সন্তান না হলেও এই ক্ষেত্রে অন্ততঃ তাঁদের পূর্ব-দৃষ্টান্ত তাঁর উপর বেশ কিছুটা ছাপ ফেলেছিল। এই কারণেই সম্ভবতঃ বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'অ্যান একার অব্ গ্রীন্ গ্রাস্' বইতে বলতে বাধ্য হয়েছেন মানিক ছিলেন একজন "বিলেটেড কল্লোলীয়ান"! (বিলম্বে আসা কল্লোলপন্থী)। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও একই ভাবের কথা বলেন যখন তিনি তাঁর 'কল্লোল যুগ' বইতে মানিককে 'কল্লোলের কুলবর্ধন" বলে আখ্যা দেন।

ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞান যে জীবনের একটা নিতান্ত খণ্ড সত্যের কারবারী, তাও ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত খণ্ড সত্য, পরবর্তীকালের পাভলভীয় বিজ্ঞানের উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে সে কথা প্রমাণিত হয়েছে। পাভলভীয় বিজ্ঞান মার্কসবাদ সম্মত। মানিক অবশ্য পাভলভীয় বিজ্ঞানের চর্চা করবার অবকাশ পাননি, তবে ফ্রয়েড থেকে যাত্রা শুরু করে বিবর্তনের অনেকগুলি স্তর পেরিয়ে যে তিনি মার্কসবাদের তীরে এসে সমুত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ক্রমপরম্পরা বিচার করলেই সে কথা বোঝা যায়।

পদ্মানদীর মাঝি মানিকের প্রথম উপন্যাস যার ভিতর অর্থনীতিক ভাবনা-চেতনার বেশ কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এটি ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। তখনও মার্কসবাদী ভাবনা-চিন্তার প্রভাব-বৃত্ত থেকে তিনি অনেক দূরে। তবু সহজ মানবিকতার আবেগ থেকে পদ্মাপারের ধীবরশ্রেণীর শোষণ-বঞ্চনার সত্যচিত্র অঙ্কনে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং পদ্মা নদীর জেলে মাঝিদের নিয়ত অভাব প্রপীড়িত অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার যে ছবি তিনি এ উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন তার শিল্পোৎকর্ষ প্রথম শ্রেণীর বললেও চলে। এই বইতেই বোঝা গেল মানিক ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে মার্কসবাদী প্রত্যয়ের অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন। এই অগ্রগতির পথেই চল্লিশের দশকে প্রথম

মাইল-ফলক হলো সহরতলী উপন্যাস দুই খণ্ড। সহরতলীতেই প্রথম অর্থনৈতিক শ্রেণীদ্বন্দ্বের বাস্তব চিত্রের পরিচয় পাওয়া গেল।

কিন্তু পদ্মানদীর মাঝি অন্যথা-সুলিখিত উপন্যাস হলেও এখানেও কামচিত্রকে বাদ দেওয়া মানিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কুবের অর্থনৈতিক শোষণের দ্বারা পর্যুদস্ত হলেও তার জৈব কামনা-বাসনা অতিশয় প্রবল। খোঁড়া স্ত্রী মালার আঁতুর যেমন বছরের এ মাথায় ও মাথায় লেগেই আছে তেমনি মালার ছোট বোন কপিলার প্রতি কুবেরের আসক্তি অপ্রতিরোধ্য। শ্যালিকাকে নিয়ে নতুন দেশে ঘর বাঁধার পরিকল্পনা অনুচিত জেনেও তারই রোমন্থনচিন্তায় কুবের বিভোর। হোসেন মিঞার কল্প-উপনিবেশ ময়নাদ্বীপে পাড়ি জমানোব কল্পনায় কুবের শুধু অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তিরই সম্ভাবনা দেখে না, জৈব বাসনার অবাধ মুক্তিরও সম্ভাবনা দেখে। কুবেরের এই জৈব ক্ষুধার তাড়না তার চরিত্রের একটি পশ্চাৎটান এবং তার জীবন সংগ্রামকে বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট কবেছে। মানবজীবনে এই কামনার আলোড়ন কমবেশী স্বাভাবিক হলেও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাহিনীতে এর আতিশয্য না থাকাই ভাল।

মানিক প্রথম দিক্‌কার লেখায় বার বার এই ভুলটাই করেছেন। ফ্রয়েডীয় অপবিজ্ঞানের প্রভাবে তাঁর বার বার শিল্পসিদ্ধির ক্ষুরধার পথ থেকে লক্ষ্যচ্যুতি ঘটেছে অথচ দেখা যায় সহরতলী উপন্যাসে এমনতর কামায়নের নামগন্ধও নেই। তার স্বাদ গন্ধই আলাদা। রাজধানীর উপান্তে অবস্থিত কারখানা-কেন্দ্রিক এক সহরতলীতে যশোদা ভাতের হোটেল চালায়। তার পাইস-হোটেলের খদ্দের যত সব মিস্ত্রি-মজুর শ্রেণীর লোক, যারা আশপাশের কারখানাগুলিতে কাজ করে। স্থূলাঙ্গিনী প্রৌঢ়া যশোদা এদের শুধু পয়সার বিনিময়ে ভাত রেঁধেই খাওয়ায় না, মায়ের মত এদের সুখদুঃখের তত্ত্বতালাশ করে এবং তাদের সন্তানবৎ স্নেহ-মমতার দৃষ্টিতে দেখে। বিগতযৌবনা অথচ প্রচুর স্বাস্থ্যবতী মেদবহুলা এই নারী নিজের ভিতর প্রচণ্ড পরিশ্রমের শক্তি ধরে এবং তার হোটেলের খদ্দেরদের কল্যাণময়ী অভিভাবিকার ভূমিকায় তার স্বতঃসিদ্ধ অধিকার। খদ্দেরদের মধ্যে কেউ নেশা করে এলে যশোদার হোটেলে তার জায়গা নেই, কারও বেচাল আচরণ দেখলে কঠিন তিরস্কারে সে তার হুঁশ ফিরিয়ে আনে। অভাবগ্রস্ত হয়ে কেউ সময়মত পয়সা দিতে না পারলে সে ধার দিয়ে সাহায্য করে, কখনও কখনও প্রাপ্য রেয়াতও করে। মোটকথা, যশোদা এক আশ্চর্য রমণী, বাংলা সাহিত্যে এই চরিত্রটির কোন দোসর নেই।

যশোদার বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের আরও কিছু উদ্‌ঘাটিত হওয়ার বাকী ছিল—তার প্রমাণ পাওয়া গেল তার নেতৃত্বের ক্ষমতায়। স্থানীয় কারখানা-মালিক সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী শোষণের একটি মূর্ত প্রতীক। সে তার মজুরদের খাটিয়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয় না, কথায় কথায় ছাঁটাই করে, আরও নানাভাবে তাদের উপর উৎপীড়ন চালায়। শ্রমিকরা যশোদার নেতৃত্বে কারখানা-মালিকের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয় ও ধর্মঘট করে। একদিকে আপাদমস্তক বজ্জাত ঘোড়েল মালিক অন্যদিকে শ্রমিক শক্তির পরিচালনায় অনভিজ্ঞা সরল-অন্তঃকরণ এক নারী—এই অসমান লড়াইয়ের ফল কী হতে পারে সহজেই অনুমেয়। শ্রমিক পক্ষের হার হয়। কিন্তু হারজিতের প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে বিষয়টাকে যদি অন্য দৃষ্টিতে দেখা যায় তো দেখা যাবে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের ময়দানে অশিক্ষিতা আধা-গ্রাম্য নারীর নেতৃত্ব দিতে এইভাবে এগিয়ে আসা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। গর্কির মা উপন্যাসের পেলাগিয়া নিলোভনা চরিত্রের সঙ্গে মানিকের সহরতলীর যশোদার কোথায় যেন এক অদৃশ্য মিল আছে।

সহরতলীর পর থেকে মানিকের লেখায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক অন্তর্নিবেশের পরিবর্তে ক্রমশঃ বহির্মুখিনতার ঝোঁক বাড়তে থাকে। এটি একটি সুস্থ দিক্‌-বদল, শুভ পরিবর্তন। কারণ ব্যক্তিমনের অন্ধকার গলি-ঘুঁজিতে অসুস্থ কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে পরিক্রমা করার বদলে সমাজের বহিরঙ্গনের রৌদ্রালোকে বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে বিচরণের অভ্যাস অনেক ভাল। মানিক যখন থেকে মার্কসীয় দর্শনের আওতার মধ্যে এলেন তখন থেকে তাঁর রচনারীতিতে এই গোত্রান্তর সূচিত হলো। তাঁর লেখার ধারা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগলো—ফ্রয়েডীয় কাম-কচায়ন তথা অন্ধকার বিলাস ক্রমেই তাঁর গল্পোপন্যাসে বিরলদৃষ্ট হয়ে উঠলো।

তবুও অভ্যাস মলেও মরতে চায় না। পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার আওতায় লালিত অবক্ষয়ী সাহিত্য রচনার ঝোঁক কি এত সহজে ঘোচবার—সে যে সে-দেশের এবং এ-দেশের সব দেশের সাহিত্যের মজ্জায় মজ্জায় ঘুণের মত সংলগ্ন হয়ে আছে।

বিস্ময়ের কথা এই যে, মানিক তাঁর এই দ্বিতীয় পর্বের জয়যাত্রার মধ্যেও অবক্ষয়ী সাহিত্যের পিছুটান একেবারে মুক্ত হতে পারেননি। কখনও কখনও মার্কসবাদকে আচ্ছন্ন করে এই পর্বেও ফ্রয়েডবাদ এসে মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে। অসুস্থ মনোবিকারের ছবি মানিক-সাহিত্যে দেখা দিয়েছে।

যেমন, চতুষ্কোণ উপন্যাস, যেমন আরোগ্য উপন্যাস। চতুষ্কোণ ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত, আরোগ্য ১৯৫৩ সালে। এই সময়ে এই দুই উপন্যাস মানিকের লেখনীতে প্রত্যাশিত ছিল না, অথচ কার্যতঃ তা-ই ঘটল। চতুষ্কোণ উপন্যাসের নায়ক রাজকুমার অসুস্থ কৌতূহলের শিকার। 'শিকার' না বলে সজ্ঞান চর্চাকারী বললেই ঠিক বলা হয়। কারণ সে জেনেশুনে তার 'মর্বিড' কৌতূহলটিকে লালন করে চলে। একাধিক যুবতীর সাহচর্যে সে আসে, কিন্তু তাদের প্রতি সে কোন ভালবাসার আবেগ অনুভব করে না, পরন্তু এক বিকৃত কৌতূহল তাদের দেহকে ঘিরে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। নগ্ন শরীরে নারীকে কেমন দেখায় এই তার অনুক্ষণ জিজ্ঞাসা। বলাই বাহুল্য, জিজ্ঞাসাটা সুস্থ নয়।

আগাগোড়া এই তুচ্ছ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মানিক একটি গোটা উপন্যাসের কলেবর দাঁড় করিয়েছেন। এতে করে যে শক্তির শোচনীয় অপচয় ঘটেছে তা কি বিশদ করে বলার অপেক্ষা রাখে? যে-পর্বের লেখায় তিনি নির্যাতিত শোষিত শ্রেণীর মানুষজনের পক্ষে বলিষ্ঠ সুরে সংগ্রামের বার্তা ঘোষণা করে চলেছেন, শ্রমিক কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জয়যুক্ত করবার জন্য তাঁর সমস্ত লেখনীর শক্তি প্রয়োগ করেছেন; সেইকালে এই জাতীয় অশ্রদ্ধেয় বিষয়ের অবতারণামূলক এক উপন্যাসের আবির্ভাব তাঁর কলমে বড় রকমের একটি ছন্দপতনের মত মনে হয়। নিতান্ত খাপছাড়া এই ব্যাপার, গোত্রান্তরিত মানিকের পক্ষে অতিশয় বেমানান।

আরোগ্য উপন্যাসেও মনোবিকলনের ছড়াছড়ি। কেশব তথাকথিত ভদ্রত্বের অভিমানী মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান কিন্তু জীবিকার দায়ে সে আজ মোটর ড্রাইভার। চোরাকারবারী ব্যবসায়ের অংশীদার ধনী অনিমেষের সে গাড়ী চালায়। অনিমেষের বিত্তোপার্জনের রহস্য তার জানা থাকায় সে অনিমেষকে মনে মনে ঘৃণা করে, কিন্তু অনিমেষের সুগায়িকা কন্যা সুন্দরী ললনার সান্নিধ্য তার ভাল লাগে। ললনা ধনীকন্যা হয়েও অর্ধশিক্ষিত মোটর ড্রাইভার কেশবকে ছোট নজরে দেখে না, বরং তার সঙ্গে দার্দ্র ব্যবহার করে। এতে কেশব ললনার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তার প্রতি এক ধরনের মুগ্ধতার আকর্ষণ অনুভব করে। সে সারাদিন ললনাদের বাড়ীতে থাকতে ভালবাসে, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই সহরতলী অঞ্চলে অবস্থিত স্বগৃহে ফিরে যাওয়া তার চাই। সেখানে তার অন্য আকর্ষণ। মায়া নামক এক পরাশ্রিতা গরিব বিধবাকে সে ভালবাসে এবং তার সঙ্গে প্রতি রাত্রে মিলিত হয়।

একদিকে ললনা অন্যদিকে মায়া এই বিপরীত আকর্ষণের টানাপোড়েনে কেশব মানসিক রোগাক্রান্ত হয়। সে আরোগ্যের সন্ধানে এ-ডাক্তার সে-ডাক্তার দেখায়।

এ পর্যন্ত কাহিনীর ছক 'মর্বিড', কেন যে শেষ বয়সে মানিক এই জাতীয় একটি উপন্যাস লিখতে গেলেন ঠিক বোঝা যায় না। ফ্রয়েডীয় কামায়নের রাহু তাঁকে চিরটা কাল কম বা বেশী প্রবলতার সঙ্গে তাড়া করে ফিরেছে, তার কবল থেকে বুঝি কোন সময়েই তার পূর্ণমুক্তিলাভ ঘটেনি। মানিকের এই প্রবণতা অনুকরণযোগ্য নয়। দেখা যায় তাঁর উত্তরকালীন লেখকদের মধ্যে অনেকেরই লেখায় কল্লোলীয় এবং তাঁর নিজের রচনার ধারা বেয়ে এই প্রভাব বিবরগামিতাকেই শুধু প্রশ্রয় দিয়েছে, সুস্থ সংস্কৃতির খাতে তাঁদের রচনাকে চালিত করতে পারেনি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু প্রমুখেরা এই প্রভাবেরই অপজাত ফল।

আরোগ্য উপন্যাসের শেষটায় অবশ্য কিছু ভিন্ন সুর পরিলক্ষিত হয়। সেইটাই যা বাঁচোয়া। উপন্যাসের শেষ হয়েছে কেশবের এই উপলব্ধিতে, "সবার জীবন শুধরে দেবার লড়াই শুরু করব ঠিক করতে রোগ যেন অর্ধেক কমে গেছে। লড়াই আরম্ভ করলে নিশ্চয়ই আরোগ্য।"

মানিক-সাহিত্যের এই সংগ্রামী সুরটাই হলো আসল সুর। খুবই মূল্যবান তার দ্যোতনা।

মানিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যশিল্পের প্রকৃতি নিরূপণ এই আলোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের কথাটা কেন মনে হলো সেটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পরে আমি তাঁর জীবন ও সাহিত্যকৃতির পর্যালোচনা করে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখি। প্রথমে 'শনিবারের চিঠি' মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়, পরে আমার 'সমকালীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরিশিষ্ট—১ দ্রষ্টব্য। ওই প্রবন্ধে একথা ঠিকই বলা ছিল যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে আদর্শনিষ্ঠ সৎ ও চরিত্রবান্ লেখক ; কিন্তু তাঁর রচনার প্রকৃতি নির্ধারণে আমার বিশ্লেষণ, এখন বুঝতে পারি, ঠিক পুরোপুরি লক্ষ্যভেদী হতে পারেনি। এই লক্ষ্য বিচ্যুতির একটা কারণ বোধহয় এই ছিল যে, তখনও পর্যন্ত অল্পবিস্তর এই ধারণার বশে লেখনী চালনা করতাম যে, সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতিকে মেশালে সাহিত্যের পতন হয়। এখন আর আমি তা মনে করি না, মনে করবার কোন কারণও দেখি না। আজকের দিনে, সাহিত্য, বস্তুত আমাদের সমস্ত জীবন, রাজনীতির সঙ্গে এমন জড়িয়ে-মিশিয়ে গেছে যে, রাজনীতিকে বাদ দিয়ে সাহিত্য করাই একপ্রকার অসম্ভব, আর করলেও সেটা জীবননিষ্ঠ সাহিত্য হবে না, হবে মৃত্তিকা-বিচ্ছিন্ন অমূল তরু-সদৃশ একটা অবাস্তব সৃষ্টিকার্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিরিশের দশকে, তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভেই, এ কথাটা বুঝেছিলেন, আমাদের বুঝতে আরও সাড়ে-তিন দশক চার-দশক সময় লাগলো—এইখানেই আমাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। যে তিক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে আলোড়িত-মথিত ক্ষতবিক্ষত হয়ে আজ আমাদের বুঝতে বাকী নেই, রাজনীতি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাকে পাশ কাটিয়ে, এড়িয়ে, সাহিত্য করবার চেষ্টা অবাস্তবতার চরম—মানিক তাঁর মৌলিক মানসগঠনের সহায়ে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেই সেটা ধরতে পেরেছিলেন। এই পচা-গলা-পোকায় খাওয়া, অসাম্যপীড়িত সমাজ বাইরে একটা মেকী ভদ্রত্বের ঢঙ বজায় রেখে ভিতরে ভিতরে যে চূড়ান্ত অবিচার অন্যায় আর শোষণকে প্রশ্রয় দিচ্ছে আর বহুর লাঞ্ছনা ও বঞ্চনায় গড়ে-ওঠা মুষ্টিমেয়ের প্রাচুর্যের বদহজমে দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে—দিবালোকের মত এ সত্য তাঁর চোখে প্রতিভাত হয়েছিল তখনি, যখন আমরা, ওই কী বলে, কল্লোল-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের অবাস্তব রোমান্টিক

মুক্তি-পিপাসাকে মুক্তির শেষ সীমা বলে ভাবতে শিখেছিলাম, এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার পাশ্চাত্য সাহিত্যের চেকনাই-কর্ষিত শৌখীন বনেদিয়ানাকে সাহিত্যিক আভিজাত্যের পরাকাষ্ঠা বলে মনে হয়েছিল আমাদের। কী ভুলই আমরা করেছিলাম! কিন্তু হায়, তার চেয়েও মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে, মানিক তাঁর জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করে আমাদের চোখের দৃষ্টি খুলতে চাইলেও আমরা অনেককাল চোখে ঠুলি এঁটে থাকতেই ভালবেসেছি, যতদিন না অপ্রতিরোধ্য, অনিবার্য বিসদৃশ সব রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর আঘাতে-সংঘাতে আমাদের চোখের ঠুলি আপনা থেকেই খসে গেছে, আমাদের মোহমুক্তি ঘটেছে। মানিক বাংলা সাহিত্যে সত্যিকার রিয়ালিজমের শুধু প্রবর্তকই নন, শ্রেষ্ঠ রূপকারও বটে।

তবে অস্বীকার করব না, মানিকের অতিরিক্ত ব্যবচ্ছেদ-প্রবণতা, চিরে-ফেঁড়ে সব-কিছুর মূল অনুসন্ধান করবার প্রবৃত্তি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মানুষের প্রত্যেকটি ভাবনা ও আচরণের কার্য-কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা—এসব অভ্যাসকে তখনও আমি খানিকটা ভয়ের চোখে দেখতাম, এখনও দেখি। তার কারণ আর কিছুই নয়, মানিকের এই দুরারোগ্য অঙ্গচ্ছেদ-প্রবণতা, এই প্রতি কথা ও কাজের পিছনে motive সন্ধানের বাতিক, তাঁকে বাংলার কথাসাহিত্যের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে দুরূহ লেখকে পরিণত করেছে। (ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মানিক সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ, অনুধাবনযোগ্য লেখক, সেই কারণেই সম্ভবতঃ সবচেয়ে কম জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে মানিককে বিচার করার মত ভুল আর কিছু হতে পারে না।)

দুরূহতা রচনার একটা গুণ নয় দোষ; তা পাঠককে সহজেই ক্লান্ত করে তোলে, কাহিনীর ক্রম অনুসরণে পাঠকের ভিতর যে একটা স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা থাকে, তাকে দমিয়ে দেয়। গল্পপ্রিয় পাঠকের কৌতুহলকে পীড়ন করবার এ একটা নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া বিশেষ—এই পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্তর্দেশ সন্ধানের অভ্যাস। এই ক্লান্তিকর ব্যবচ্ছেদী প্রবণতাকে মানিক তাঁর বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক রচনায় এই বলে সমর্থন করেছেন যে, তিনি ছিলেন কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র, সেই বিজ্ঞান-পড়া মনই তাঁকে মানুষের অন্তর চিরে-ফেঁড়ে বিশ্লেষণ করার দিকে অবধারিতভাবে টেনে নিয়ে গেছে।

এই ব্যাখ্যায় আমার মন সম্পূর্ণ সায় দিতে চায় না। বিজ্ঞান পড়লেই যদি মানুষ সাহিত্য রচনায় ব্যবচ্ছেদী প্রবণতার দিকে ঝুঁকত তো আমাদের সাহিত্যে যত বিজ্ঞান-পড়ুয়া লেখক আছেন তাঁরা সব এক-একজন বিশ্লেষণী

আর ব্যবচ্ছেদী প্রতিভার কেষ্টবিষ্টু হতেন। অথচ কার্যতঃ তার উল্টোটাই দেখি। একজন প্রবীণ বিজ্ঞান-পড়ুয়া লেখককে জানি, যিনি বাংলা ভাষায় গুরুবাদী ভক্তিনির্ভর সাহিত্যের অবতার-বিশেষ। বিদেশ থেকে সর্বোচ্চ বিজ্ঞানের পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ একাধিক শাঁসালো বিজ্ঞানী আমাদের মধ্যে রয়েছেন, যাঁরা ব্যক্তিজীবনে তাবিচ-কবচের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন এবং মঠ-মন্দিরে সাধু-মোহান্তদের পায়ে মাথা না ঠেকালে যাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার ষোলকলা পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞান পড়ার সঙ্গে, অন্ততঃ যেভাবে বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়া ও লওয়া হয় তার সঙ্গে, সাহিত্যিক ব্যবচ্ছেদী বৃত্তির কোনই সম্পর্ক নেই। ওটা মানিকের মনের ভ্রম মাত্র। বিজ্ঞানকে আত্যন্তিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি বিজ্ঞানকে একটা fetish-এ পরিণত করেছিলেন বলা যায়। এ ব্যাপারে এক ধরণের আবেশ—obsession—তাকে পেয়ে বসেছিল বলে সন্দেহ করবার কারণ আছে। তাঁর নিজের রচনাতেই তিনি বলেছেন ছোটবেলা থেকেই তিনি 'কেন' নামক মানসিক রোগে ভুগতেন, এই রোগ বিজ্ঞান পঠনের সূত্রে আসেনি।

ওসব বিজ্ঞান-পড়া-টড়া কিছু নয়, আসলে মানিক সহজাতভাবেই ছিলেন বিশ্লেষণী প্রতিভার অধিকারী, অপরিসীম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। বিজ্ঞান সেই বৈশিষ্ট্যের উপর একটা উপর-পালিশ দিয়েছিল মাত্র। তাঁর প্রখর তলাতিশায়ী দৃষ্টি জীবনের এবং মানুষের একেবারে মর্মমূল পর্যন্ত ভেদ করে দেখতে জানত। দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট—দুইয়েরই পক্ষে অস্বাস্থ্যকর এই মর্মভেদী মনোযোগের কবল থেকে রাষ্ট্র, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি কারুরই রেহাই ছিল না। প্রতিষ্ঠানকে বিচার করতে গেলেই তিনি তাঁর motivationটা আগে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন, মানুষের সান্নিধ্যে এলে তিনি তাঁর আচরণের খুঁটিনাটি, এমনকি চিন্তা-ভাবনার সূক্ষ্মতম ভঙ্গিটুকু পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন তলিয়ে বোঝবার। এমন লেখক নিজের জালেই যে নিজে আবদ্ধ হয়ে গেছেন—তাঁর ওই শোধনের অতীত মর্বিড-ধর্মী মনঃসমীক্ষণের অভ্যাসের জালে।

বলাই বাহুল্য যে, এই অভ্যাস লেখকের পক্ষে আরামদায়ক হয়নি। তিনি গল্পোপন্যাসের বর্ণিত চরিত্রগুলির মন অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে যেমন এক ধরনের নিষ্ঠুর সাদীয় (sadistic) উল্লাস বোধ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে যন্ত্রণাও ভোগ করেছেন বড় কম নয়। যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এই কারণে যে, এই অভ্যাসকে অতিক্রম করবার তাঁর কোন উপায় ছিল না, ওটা তাঁর স্বভাবের মজ্জার মধ্যে ছিল নিহিত। যে স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে ইচ্ছা করলেও

অতিক্রম করা যায় না, অলঙ্ঘনীয় নিয়তির মত যা রাহুর প্রেম হয়ে সর্বদা পিছু পিছু ফেরে, তা লেখকের মনোজীবনের বিস্ময়কর সমৃদ্ধির কারক হলেও তা একই সঙ্গে যন্ত্রণারও কারক। নিজেকে নিজে ডিঙিয়ে যেতে না পারার যে অক্ষমতা, সেই অক্ষমতায় এই যন্ত্রণার জন্ম।

কিন্তু একই সঙ্গে এই বিষামৃতের অভিজ্ঞতা ভোগ করা ছাড়া মানিক আর কী-ই বা করতে পারতেন। তিনি স্রষ্টা, সৃষ্টিকার্যে তাঁর আনন্দ; কিন্তু যে সমাজ-ব্যবস্থাকে উপলক্ষ করে সৃষ্টি, সেই সমাজ-ব্যবস্থাটি যে ভিতরে ভিতরে ঘুণ ধরে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, সেই ফোঁপরা ঝরঝরে দোমড়ানো-মোচড়ানো সমাজের রূপায়ণে গরলপানের অনুভব ছাড়া তাঁর আর কী-ই বা অনুভব হতে পারে? এ সমাজের আসল চেহারাটা যে তাঁর দেখা হয়ে গিয়েছিল, জানা হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ আর অভ্রান্ত মনন দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই সমাজের বাইরে একটা ভদ্রতার আবরণ আছে ঠিক কিন্তু ভিতরে চলেছে মিথ্যার কারবার—পরস্পরের মধ্যে গলাকাটা প্রতিযোগিতা, স্বার্থান্ধতা, পরকে দুপায়ে মাড়িয়ে যেনতেনপ্রকারেণ আত্মসুখ চরিতার্থ করবার স্পৃহা। শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার অবিচার ভেদবুদ্ধি প্রভৃতি বিচিত্র মানসিকতা ও আচরণে মিলে গোটা সমাজ জীবনটাই হয়ে উঠেছে একটা ক্রূরতার লীলাক্ষেত্র। যে শিল্পীর মর্মবিদ্ধকারী অন্তঃসঞ্চারী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে যে, এ সমাজে ভদ্রলোকরাই হচ্ছে সবচেয়ে ছোটলোক, সেই শিল্পী কেমন করে ভদ্রশ্রেণীর তথাকথিত প্রেম আর বিরহ আর আনুষঙ্গিক অন্যান্য জীবন-বিলাস নিয়ে অপরাপর মধ্যবিত্ত লেখকদের ধরনে মিষ্টি-মিষ্টি প্রেমের গল্প ফাঁদবেন? যেখানে অগণিত মানুষের বেঁচে থাকার বিড়ম্বনার মর্মান্তিক দৃশ্যের উপরে পদে পদে হোঁচট খেয়ে পড়তে হয় আর ভোগ করতে হয় অন্তহীন দুঃখ-বেদনা, সেখানে কল্পিত এক আনন্দ আর সৌন্দর্যবাদের বন্দনাগানে কেমন করে মুখর হয়ে ওঠা সম্ভব?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার ওই-যে দুরারোগ্য ব্যবচ্ছেদী অভ্যাসের কথা বলেছি, যা তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্প ও উপন্যাসকে অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত করে রেখেছে, সে কি আর অমনি তাঁকে আশ্রয় করেছিল? যে শিল্পীর মোহভঙ্গ হয়ে গেছে বাইরের চোখ ঝলসানো প্রতিমার অন্তরালবর্তী খড়কুটার স্থূল কাঠামোটি যাঁর চোখে ধরা পড়ে গেছে, তাঁর বেলায় এ তো হতেই হবে। তিনি পচনশীল সমাজের এই অবক্ষয়ী মানুষদের মন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ না করে করেন কী, 'ভদ্র' নরনারীর অসার প্রেমকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ না করে কি

তাঁর যো আছে? নইলে যে নিজের কাছেই নিজেকে তিনি কৈফিয়ৎ দিতে পারবেন না। আর সেই সঙ্গে, সমাজের যত নির্যাতিত শোষিত স্তরের খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষ আছে তাদের যে তিনি ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান, সংগ্রামশীল হতে বলেন, তারও মূল রয়েছে তাঁর ওই মোহভঙ্গের মধ্যে। মধ্যবিত্ত-সমাজের প্রগতিশীল ভূমিকার বিষয়ে যে কথাটা খুব বড় করে বলা হয় সেটা যে আসলে একটা শূন্যগর্ভ বুলি মাত্র, মধ্যবিত্তদের স্বীয় শ্রেণীগত আত্মাভিমান স্ফীত করবার একটা প্রকরণ, তা তাঁর চাইতে আর কে বেশী গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন? আর তাই তো মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে ধীরে ধীরে মনোযোগ প্রত্যাহার করে নিয়ে তিনি সংগ্রামী শ্রমিক আর কৃষকের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ক্রমেই বেশী বেশী মাত্রায় তাঁর রচনার উপজীব্য করে নিয়েছিলেন। এখানেও মনোবিশ্লেষণ বাদ পড়েনি, কিন্তু তার পিছনে আছে একটা সুস্পষ্ট গঠনমূলক লক্ষ্য। তিনি নীচুতলার সংগ্রামী মানুষদের সামনে এই পচ্‌-গলা পোকায়-খাওয়া অধঃপতিত সমাজ কাঠামোটিকে গুঁড়িয়ে ফেলে তার ভগ্নাস্থির উপর নূতন সমসমাজের ভিত্‌ গেঁথে তোলার আদর্শ রেখেছিলেন। এদের বেলায় নিছক মনোবিশ্লেষণের খাতিরেই তিনি মনোবিশ্লেষণ করেননি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'জননী'। কিন্তু তার আগেই তিনি 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটি লিখেছিলেন। যদিও দিবারাত্রির কাব্যের প্রকাশকাল জননীর পরে। দিবারাত্রির কাব্য মানিকের একুশ বছর বয়সের রচনা। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে ভাবি, একুশ বছরে এমন যাঁর পরিণত মনন, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী, সুগঠিত ভাষার বাঁধুনি, তিনি যদি আমাদের দেশের অন্যান্য একাধিক অন্যায় রকমের ভাগ্যবানদের মত সাহিত্যানুশীলনের উপযুক্ত অনুকূল পরিবেশ পেতেন. স্থিতাবস্থার সঙ্গে আপস না করবার জেদে আর আদর্শের শিখা অনির্বাণ রাখবার প্রেরণায়, সংগ্রামে সংগ্রামে যদি তাঁর জীবন ক্ষয়প্রাপ্ত না হতো, দীর্ঘতর আয়ুধন্য যদি তিনি হতেন, তা হলে আরও কত অবিস্মরণীয় সৃষ্টিপ্রাচুর্যের দানই না রেখে যেতে পারতেন তিনি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে, এ সম্ভাবনা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ তা হতে পারেনি। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে এই প্রচণ্ড শক্তিধর লেখকের জীবনাবসান ঘটে। বাংলা গল্পোপন্যাসসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে দান তিনি রেখে গেছেন তা পরিমাণে যথেষ্ট ভারী হলেও, দিবারাত্রির কাব্যে তিনি যে বিস্ময়কর প্রতিশ্রুতি বহন করে নিয়ে এসেছিলেন, অমর লেখক হবার যে সম্ভাব্যতা তাঁর

মধ্যে দেখা গিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি আর সে সম্ভাবনা কিন্তু পরে আর তাঁর দ্বারা পূরণ হতে পারেনি, আস্তে আস্তে তাঁর শক্তি ক্ষীয়মাণ হয়ে এসেছিল বলে সন্দেহ করবার কারণ আছে। এ সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে বলব, আপাতত কালানুক্রম রক্ষা করে অগ্রসর হই।

দিবারাত্রির কাব্য প্রেমের উপন্যাস। কিন্তু এমন অদ্ভুত বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রেমকে কেউ বাংলা সাহিত্যে দেখেছেন বলে আমার জানা নেই। এই লেখকটি যে অত্যন্ত মৌলিক দেখার চোখ নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন ওই প্রথম উপন্যাসেই তার ভুরি ভুরি প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। হেরম্ব যে আসলে লেখকেরই মনের প্রক্ষেপণ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে হেরম্ব নারীর রূপসৌন্দর্যের অনুরাগী কিন্তু দেহাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত ভাববাদী (প্লেটোনিক) প্রেমের আদর্শের প্রতীক। মধ্যরাত্রে সুপ্রিয়ার মিলনেচ্ছাকে তাঁর প্রত্যাখ্যান কিংবা প্রেমের ক্ষণস্থায়িত্বের মধ্যেই তার চিরকালীনত্বের নিশানা জাতীয় আপ্তবাক্যের বক্তৃতায় আনন্দকে ঘায়েল করার চেষ্টা ("একমাসের বেশী প্রেম কারো সহ্য হয়? মরে যাবে আনন্দ—একমাসের বেশী হৃদয়ে প্রেমকে পুষে রাখতে হলে মানুষ মরে যাবে।" ইত্যাদি) থেকে এই রকমেরই একটা ধারণা হতে পারে পাঠকের মনে। কিন্তু অত সহজ আর অজটিল মনের মানুষ হেরম্ব নয়। মানিকও নন। তাঁদের মনোভঙ্গীর মধ্যে আছে প্রেমকে পদে পদে ছিঁড়ে ফেঁড়ে দেখবার অস্বাভাবিক—হাঁ, লৌকিক মানদণ্ডে তাকে অস্বাভাবিকই বলব, এমন কি বিকৃতও বলা যায়—প্রবণতা। আর ভালোর জন্যে হোক মন্দের জন্যে হোক ওইখানেই মানিকের লেখনীর বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য কাহিনীতে তো বটেই, প্রেমের কাহিনীতেও তাঁর মনঃসমীক্ষণের অভ্যাস আষ্টেপৃষ্ঠে ছড়ানো। এ এক দুরারোগ্য বৃত্তি, যা মানিকের রচনাকে শুরু থেকেই অন্যান্যের রচনা থেকে বিশ্লিষ্ট করে দিয়েছে। প্রথম উপন্যাস বলেই হয়তো প্রেমের উপন্যাস ফেঁদে বসেছিলেন কিন্তু তা-ও কিনা স্বভাবগুণে হয়ে দাঁড়ালো অত্যন্ত তির্যক্ মনোভঙ্গীর জটিল এক মনস্তাত্ত্বিক আলেখ্য। তিনি এই উপন্যাসে হেরম্বর মুখ দিয়ে আক্ষেপের স্বরে বলেছেন, "এরা কেউ বিশ্লেষণ ভালবাসে না। আর এ কি অভিশাপ যে, এরা কেন বিশ্লেষণ ভালবাসে না বসে বসে তাও বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা হয়? একি জ্ঞানের জন্য? নারীকে জেনে সে কি জীবনের নাড়ীজ্ঞান আয়ত্ত করতে চায়? তার লাভ কি হবে? বরং আজ পর্যন্ত তার যা ক্ষতি হয়েছে তার তুলনা নেই। জীবনের সমস্ত সহজ উপভোগ তার বিশাক্ত বিস্বাদ হয়ে যায়।"

অত্যন্ত অর্থপূর্ণ উক্তি। আতিশয্যমণ্ডিত বিশ্লেষণ প্রবণতার অভিশাপ এখানে অসংকোচে কবুল করা হয়েছে—নিজের জবানীতে না হলেও, লেখকেরই প্রক্ষেপণ স্বরূপ উপস্থাপিত একটি চরিত্রের মাধ্যমে। সত্যিই তো, কেবলই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরের মন যদি বিশ্লেষণ করা যায় তা হলে জীবনের সমস্ত সহজ উপভোগ বিষাক্ত-বিস্বাদ হয়ে যাবে না তো কী হবে? কিন্তু মানিক স্বেচ্ছায় এই ভাগ্য বরণ করে নিয়েছিলেন—এটিকে তার অবাঞ্ছিত কিন্তু অনিবার্য সাহিত্যিক নিয়তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এর মূল্যও দিতে হয়েছে তাঁকে জীবনভোর—পরের মন, অভিপ্রায়, আচরণের কার্যকারণ নিরূপণের বিসদৃশ উল্লাসে নিজের সুখশান্তি তাঁকে অনেকখানি পরিমাণে বিসর্জন দিতে হয়েছে। চাইলেই কি তিনি এই নিয়তিকে অতিক্রম করতে পারতেন? না, তা তিনি পারতেন না। কেননা, অপরের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো যায়, নিজের কাছ থেকে তো পালিয়ে বেডাবার উপায় নেই। বিজ্ঞান-পড়ার সূত্রে নয়, জন্মসূত্রেই যিনি ব্যবচ্ছেদী প্রবণতা স্বভাব হিসাবে অর্জন করেছেন, তিনি নিজেকে নিজে খণ্ডাবেন কী করে?

কিন্তু এই ব্যবচ্ছেদী বিশ্লেষণের দ্বারা প্রেমকে কি কখনও সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায়? তা-ও কি সম্ভব? অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় প্রেমকে পরীক্ষার বস্তুতে পরিণত করলে কি প্রেমের মহিমা থাকে? প্রেম কি একটা যুক্তিবুদ্ধিগ্রাহ্য মনোভাব যে যুক্তির আলোয় ওই অবুঝ অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলা যাবে? যায়ও নি. দিবারাত্রির কাব্য প্রেমের গদ্যকাব্য হিসাবে সার্থকতা পায়নি কিন্তু মানিক যে কী অসামান্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনঃসমীক্ষণধর্মী লেখক তার প্রমাণ ওই প্রথম রচনাতেই অপ্রতিবাদ্যরূপে মুদ্রিত।

আর কি ভাষার সৌষ্ঠব! এমন জটিল মননের প্রক্রিয়া এমন সহজ স্বচ্ছন্দ শব্দ ব্যবহারের দ্বারা মানিকের আগে-পরের আর কোন লেখক পরিস্ফুট করতে পেরেছেন বলে জানি না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি কিংবা ঘরে-বাইরে উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক চিত্রণের মধ্যে আছে রসের দ্যোতনা, শরৎচন্দ্রে আছে জবজবে আবেগের কিছু ফেনা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে আছে যে পরিমাণে সূক্ষ্ম অনুভব ঠিক সেই পরিমানেই পঙ্গু ভাষা; কিন্তু মানিক তুলনাহীন। তাঁর বিশ্লেষণাত্মক ব্যবচ্ছেদী রচনাভঙ্গীর মধ্যে রস কম কিন্তু আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা। আর ভাষাও সেই অনুপাতে অতি প্রখর। অথচ সহজ ছাঁদের ভাষা, এমন জটিল তির্যক্‌বক্র ভাবনা এমন সরল ভাষায় প্রকাশ করবার কৌশলটি তিনি কেমন করে আয়ত্ত করেছিলেন তা-ই ভেবে অবাক হয়ে যেতে হয়।

অধ্যাপকীয় লেখকদের ধরনে উদ্ধৃতি দেবার অভ্যাস আমার নেই। আমার এটি অনাবশ্যক ব্যায়াম বলে মনে হয় এবং অল্পেতেই তাতে ক্লান্তি আসে। তবু পাছে পাঠক মনে করেন মানিকের সহজ ভাষায় জটিল মনন প্রকাশের বক্তব্যটি আমার একটি ঢালাও মন্তব্য, তার পিছনে সাক্ষ্যপ্রমাণের জোর তেমন নেই, সেই কারণে এ বিষয়ে দিবারাত্রির কাব্য গ্রন্থ থেকে একটি উদাহরণ দেব। তবে মাত্র একটি উদাহরণ। তার বেশী নয়। তাই থেকে পাঠক বোঝেন তো ভালো, নয় তো আমি নাচার।

স্ত্রীকে খুন করে ধরা-পড়া থানার কয়েদে আটক কোনো এক সাধারণ খুনীর বিষয়ে সুপ্রিয়ার দারোগা স্বামী অশোককে উদ্দেশ করে হেরম্বর বক্তৃতা, "…না, স্ত্রীকে ও ভালবাসত না। স্ত্রী আর একজনকে ভালবাসে বলে সে তাকে খুন করে অথবা কষ্ট দেয়, অবহেলা করে, স্ত্রীকে সে ভালবাসে না। তুমি বুঝতে পার না অশোক, ভালবাসার বাড়া-কমা নেই? ভালবাসার ধৈর্য আর তিতিক্ষা? একটা একটানা উগ্র অনুভূতি হল ভালবাসা, তুমি তাকে বাড়াতে পার না কমাতে পার না। স্ত্রীকে খুন করে ফেলতে চাও কর, কিন্তু তারপর একদিনের জন্য যদি তোমার ভালবাসায় ভাঁটা পড়ে, মনে হয় খুন না করলেই হত ভাল, সেইদিন জানবে, ভালবেসে স্ত্রীকে তুমি খুন করনি, করেছিলে অন্য কারণে। স্ত্রীকে যে ভালবাসে সে অপেক্ষা করে। ভাবে, এখন ও ছেলেমানুষ, আর একজনের স্বপ্ন দেখছে। দেখুক, যৌবনে ওর প্রেম পাব। ভাবে, যৌবন ওকে অন্ধ করে রেখেছে, ও তাই অতীতের অন্ধকারটাই দেখছে। দেখুক, যৌবন চলে গেলে আমি ওকে ভালবাসব। আচ্ছা অশোক, তোমার কি কখনো মনে হয় না যে প্রিয়া আর একজনকে ভালবাসছে এই অবস্থাটাকে মৃত্যু দিয়ে অপরিবর্তনীয় করে দেওয়া বোকামি? কষ্ট দিয়ে আর একজনের প্রতি এই ভালবাসাকে, এই মোহকে প্রবল আর স্থায়ী করে দেওয়া মূর্খামি? একি স্ত্রীকে ভাল না বাসার প্রমাণ নয়?"

দিবারাত্রির কাব্যের তুলনায় জননী অনেক অনুগ্র (tame) রচনা। তার বিষয়বস্তুও স্বতন্ত্র এবং গতানুগতিক। বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের পারিবারিক কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ এক জননী হলো এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। পরিবারের সকলের সকল প্রকার দায়দায়িত্ব বহনকারিণী উদয়াস্ত কর্মকারিণী শ্যামা সন্তান ও আশ্রিত বাৎসল্যের প্রতীক, তবে বাঙালী সংসারের এই মায়ের আদল এতই পরিচিত যে মানিক এখানে তাঁর অভ্যস্ত তির্যক্ রচনাবৈশিষ্ট্য ফোটাবার বিশেষ কোন অবকাশ পাননি।

প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁর মত বক্রমনোভঙ্গীর লেখক এমন একটি মামুলি বিষয় কেন যে নির্বাচন করেছিলেন তা-ই ভেবে এক একসময় অবাক্ হতে হয়। যাঁরা শ্যামা চরিত্রের সঙ্গে গর্কির 'মাদার' চরিত্রের প্রতিতুলনা খোঁজেন তাঁরা মানিককে সামান্যই বুঝেছেন, গর্কিকে একেবারেই বোঝেননি। নাম-সাদৃশ্য ছাড়া এই দুই বইয়ের ভিতর আর কোন মিলই নেই। বরং গর্কির মাদারের স্পষ্ট আদল এসেছে 'সহরতলী' উপন্যাসের যশোদা চরিত্রের মধ্যে। সন্তানবাৎসল্য (ব্যাপক অর্থে), দুঃখীজনদের প্রতি দরদ, কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা এবং সংগ্রামশীলতা এই চতুর্বিধ লক্ষণেই পেলাগিয়া নিলোভনা আর যশোদা সমভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। যশোদা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

আর এই আশ্চর্য সৃষ্টির জন্যই সহরতলী উপন্যাস মানিক-রচনাবলীর মধ্যেও একটি স্বতন্ত্র আয়তন লাভ করেছে। বিশেষতঃ সহরতলী প্রথম পর্ব। প্রথম পর্বের তুলনায় দ্বিতীয় পর্ব অত্যন্ত জোলো মনে হয়। এতই জোলো যে, ওই দুইটি বইকে একসঙ্গে গ্রথিত করে দেখতে আমার আদপেই ইচ্ছা হয় না। একই শিরোনামের আচ্ছাদনে এমন অসমান দুটি বই আর হয় না। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হলো 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ('ইতিকথার পরের কথা'কে বাদ দিয়ে), তার পরেই সহরতলী প্রথম পর্বের নাম করতে হয়। পুতুলনাচের ইতিকথা'য় শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্বের সঙ্গে প্রগাঢ় সহজ দার্শনিকতার সমন্বয় ঘটেছে, আর সহরতলী প্রথম পর্বে মাতৃহৃদয়ের স্নেহশীলতার সঙ্গে শ্রমিক আদর্শের জয়মহিমা একত্র গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে অদ্ভুত এক সামঞ্জস্যের ডোরে। যশোদা সমাজের যে স্তর থেকে উঠে এসেছে তাকে মধ্যবিত্ত স্তর তো বলা চলেই না, নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরও বলা চলে কিনা সন্দেহ, লেখাপড়াও সে বিশেষ জানে না : অথচ শুদ্ধমাত্র চরিত্রমাহাত্ম্যে এক দঙ্গল কারখানার মজুর শ্রেণীর মানুষের উপর তার অপ্রতিহত অধিকার। সে তাদের ধর্মঘট করতে বললে তারা ধর্মঘট করে, মালিকের সঙ্গে শালিস-মীমাংসায় বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে বললে তারা বিবাদ মিটিয়ে নেয়। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকেই স্বামী-পুত্রকে হারিয়ে সেই যে সে গ্রাম থেকে এই বৃহৎ নগরীর উপকণ্ঠস্থিত শহরতলীতে এসে বাসা বেঁধেছে, তারপর এখানেই সে বরাবর রয়ে গিয়েছে। মধ্যবয়সিনী স্থূলাঙ্গিনী এই বৃহৎবপু রমণীকে সকলেই চাঁদের মা বলে। সে একটি ছোটখাটো হোটেল চালায় আর যত রাজ্যের হাড়হাবাতে মজুর আর বেকারকে এনে জুটিয়েছে তার সদাব্রত এই

সরাইখানায়। সে তাদের নিজের হাতে ভাত রেঁধে খাওয়ায়। (ভাত রেঁধে খাওয়ানোর মধ্যে যেন এদেশের সনাতন মায়ের মূর্তিটি প্রকট। অন্নদাত্রী নয় তো যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা!) তাদের চাকরি জুটিয়ে দেয়, প্রয়োজনে টাকা ধার দেয়, রোগে সেবা করে, ইত্যাদি। এইভাবে মতি, সুধীর, নন্দ (নিজের ছোট ভাই), জগৎ, ধনঞ্জয় প্রমুখকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। কিন্তু ভদ্রলোক কাউকে বাড়ীতে থাকতে দেয় না। ভদ্রলোকের নীতিবোধের সঙ্গে যশোদার নীতিবোধ মেলে না। 'ছোটলোক'দের নিয়েই তার সংসার আর তাদের খাইয়ে-পরিয়েই তার আনন্দ।

কিন্তু এটা হলো যশোদার স্নেহ-মূর্তি। তার একটা সংগ্রাম-মূর্তিও আছে। আর সেইটেই এই চরিত্রটিকে একটি অনন্যতা দিয়েছে। সে বলে "কাজ দেবার মতলব কারও থাকে না, কাজ আদায় করে নিতে হয়।" সে আরও বলে, "মালিক শ্রমিকদের দাবি মিটিয়ে দিলেই শ্রমিকেরা মালিকের কথা শুনবে। নয়তো শুনবে কেন।" কারখানার শ্রমিকদের উপর তার এমনই একচ্ছত্র প্রভাব যে সে একটা মুখের কথা বললেই তারা কাজে যাওয়া বন্ধ রাখে। মালিক সত্যপ্রিয় একটি আস্ত ঘুঘু (এই চরিত্রটিতে একটি বাস্তব আদল আছে), কিন্তু যশোদার কাছে তার জারিজুরি খাটে না। কিন্তু প্যাঁচালো বুদ্ধিতে এই সরলা নারী ওই আস্ত বাস্তুঘুঘুর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কেন? শেষে ওই ঘোড়েল ঘড়িয়ালের এক কিস্তির চালে যশোদা মাত হয়ে যায়—তার সাধের সরাইখানাটি ভেঙে যায়, মজুরেরা সব ছত্রখান হয়ে পড়ে।

যশোদা চরিত্রের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অভিনব—বাংলা সাহিত্যে এ একেবারেই নতুন জিনিস। মানিকের নিজের কথাতেই চরিত্রটির একটি বর্ণনা দিই— "একটু খাপছাড়া জীবন-যাপন করে বৈকি যশোদা, একটু অনন্যসাধারণ হয় বৈকি তার রীতিনীতি চাল-চলন, কিন্তু খুব বেশী বে-মানান যেন তার পক্ষে হয় না। এর কম অবস্থায় অন্য কোন স্ত্রীলোক হয় পুরুষের আশ্রয় খুঁজিত নয় মানুষের মতবাদ ও নির্দেশের চাপে ধ্বংস হইয়া যাইত, যশোদা কিছুই করে নাই। জীবন-যাপন করে সে স্বাধীন, কারও কাছে তার কোন প্রত্যাশা নাই, নিন্দা প্রশংসা সে গ্রাহ্য করে না, কারও দরদের জন্য কাঁদিয়াও মরে না। বিপদে-আপদে তারই কাছে মানুষ উপকার পায়, পুরুষের কাছে যে কাজ পাওয়া কঠিন যশোদার কাছে তাই পাওয়া যায়। লম্বা-চওড়া শক্ত-সমর্থ শরীরটাতে তার নারীসুলভ লাবণ্য ও কোমলতার চিরদিন এমন অভাব যে, বয়স যখন আরও কম ছিল তখনও কোনও পুরুষের সঙ্গে তার বৈধ বা অবৈধ

প্রেমের সম্পর্ক থাকিতে পারে এ কথাটা মনে আনিতেও লোকের কেমন সংকোচ বোধ হইত, মনে হইত, না, তা হয় না।"

'পদ্মানদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস। একাধিক বিদেশী ভাষায় এই উপন্যাসটির অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু এটি মানিকের সর্বোৎকৃষ্ট রচনা নয়। এর বর্ণনার ধারা চলেছে লোকপ্রিয় উপন্যাসের ধারা অনুসরণ করে স্থূল ঘটনার বর্ণনের স্তরে, জটিল মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনের ধারা বয়ে নয়। 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'অহিংসা' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে মানুষের অবচেতন মনের আলো-আঁধারের লীলার যে অপূর্ব শিল্পগুণান্বিত অথচ শক্তিশালী বিশ্লেষণ পাই, এ উপন্যাসে তা পাই না। এ উপন্যাসের কাজ যেন কিছু মোটা হাতের, সূক্ষ্ম তুলির পোঁছ বড়-একটা চোখে পড়ে না। তবু যে পদ্মানদীর মাঝি বাঙলা-ভাষাভাষী পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করেছে সে তার বিষয়বস্তুর অভিনবত্বগুণে ও সুন্দর একটি কাহিনীর যাদুপ্রভাবে। পদ্মানদীর তীরস্থ মাঝিদের জীবন-সংগ্রাম, দারিদ্র্য, কাম, প্রেম, বঞ্চনা, শোষণ সবই এই উপন্যাসটিতে অতিমনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হয়েছে—কোথাও অতিরিক্ত মনস্তত্ত্বের গহনে প্রবেশের চেষ্টা নেই। পদ্মা নদীর তীরের ভাষার ডৌলটিকে সংলাপে খুবই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—লোক-জীবনের সঙ্গে মানিকের অন্তরঙ্গতা যে কত নিবিড় ছিল এই সংলাপ তার প্রমাণ, তবে লক্ষ্য করবার বিষয় পদ্মা নদীর বর্ণনা খুব প্রাধান্য পায়নি। এটা মানিকের স্বভাবসম্মত হয়েছে বলেই মনে হয়। মানিকের কৌতূহল মানুষে, পরিবেশে নয়, যদিও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ কিভাবে বেঁকে চুরে দুমড়ে যায় তা দেখাতে তিনি ভোলেন না। বস্তুতঃ এটাই তাঁর সকল কাহিনীর মূল উপজীব্য। একজন তারাশঙ্কর কিংবা বিভূতিভূষণ যে স্থলে বন্যাপ্লাবিত ময়ূরাক্ষী অথবা অজয় কিংবা ইছামতীর উচ্ছ্বাসের বর্ণনায় ফেনায়িত হয়ে উঠতেন, সে স্থলে পদ্মার মত আপাত-পারাপারবিহীন সর্বনাশা বিশাল নদীর বেলায় ফেনিল বর্ণনার বহুগুণ বেশী অবকাশ থাকা সত্ত্বেও এখানে-ওখানে দু-চারটি সংক্ষিপ্ত রেখাঙ্কণে মাত্র বর্ণনার কাজটি তিনি সমাপ্ত করেছেন। ইত্যবসরে তাঁর সকল মনোযোগ গিয়ে পড়েছে কেতুপুর গাঁয়ের জেলেপাড়ার চূড়ান্ত দারিদ্র্য পীড়িত মানুষগুলির উপর। তাদের জীর্ণ ঘরের চালা বর্ষার জল ঠেকাতে পারে না, একটু ঝড়তুফান হলেই মেঝে জলে একাকার, স্যাঁতসেতে খড় বিছিয়ে—তাও সব সময় জোটে না—সকলের একত্র গাদাগাদি করে শোওয়া, উঠোনে কাদা ও আগাছার জঙ্গল, তুফান বিষম হলে কখনও

কখনও ঘরচাপা পড়ে মরা কিংবা জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে যাওয়া, পান্তাভাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি, ছেঁড়া ত্যানা পরে কাটানো, ঋণ ও সুদের পীড়ন, নৌকোর অভাবে পরের নৌকোয় মাঝিগিরি করা—এই হলো কেতুপাড়া আর আশেপাশের দশটা গ্রামের জেলে-জীবনের চিরন্তন চিত্র। এই চিত্রটিকেই লেখক তাঁর সমস্ত দরদ দিয়ে এঁকেছেন কুবের এই কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ঘিরে লোকজীবনের বৃত্ত টেনে। বাংলা ভাষায় পরবর্তীকালে নদীমাত্রিক ও লোকজীবনকেন্দ্রিক যে কটি উপন্যাস রচিত হয়েছে—যেমন, অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', আবদুল জব্বারের 'ইলিশমারীর চর' প্রভৃতি—সেগুলির পিছনে পথিকৃৎ মানিকের এই নতুন পরিকল্পনা যে অনেকখানি প্রেরণারূপে কাজ করেছে তা অনুমান করা শক্ত নয়।

কুবের ও কপিলার প্রেমকাহিনী কিছু স্থূল। কিন্তু শিক্ষার পালিশবঞ্চিত নীচুতলার জীবনের প্রেম বলুন মোহ বলুন, জৈব চাওয়া-পাওয়ার রূপ এর চেয়ে বেশী মার্জিত আর কেমন করে হতে পারত? বরং তাদের সংযমটাই সমধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হোসেন মিয়া চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে নতুন তবে তাকে যথাযথভাবে বিকশিত করে তোলার সুযোগ লেখক গ্রহণ করেননি। সে ছাড়াছাড়াভাবে ঘটনার মঞ্চে একবার এসেছে পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়েছে—এইভাবে সারাটা কাহিনী জুড়ে চলেছে তার আগমন-নিষ্ক্রমণের পালা। ফলে চরিত্রটি দানা বাঁধতে পারেনি। তবে তার নোয়াখালির সমুদ্রান্তর্গত জনশূন্য চর ময়নাদ্বীপে নতুন উপনিবেশ গড়ার স্বপ্ন চরিত্রটির মধ্যে একটি স্বপ্নালুতা আরোপ করেছে, নিছক অর্থনৈতিক লাভালাভের সূত্রের দ্বারা যার ব্যাখ্যা মেলে না।

পুতুলনাচের ইতিকথা নিঃসন্দেহে মানিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এতে লেখকের লেখনী সবচেয়ে যাতে স্ফূর্তি লাভ করে, সেই মনস্তত্ত্বের আলো-আঁধারির রহস্যলীলার রূপায়ণ চূড়ান্ত শৈল্পিক অভিব্যক্তি লাভ করেছে। কিন্তু এইটেই যদি উৎকর্ষের একমাত্র মানদণ্ড হতো তা হলে দিবারাত্রির কাব্য, চতুষ্কোণ, দর্পণ, অহিংসা প্রভৃতি উপন্যাসের সমসারিতে বসিয়েই তার বিচারক্রিয়া চলতে পারত—এগুলির মাথা ছাপিয়ে এই উপন্যাসে উৎকর্ষের একটি নতুন আয়তন আবিষ্কার-চেষ্টার আবশ্যকতা হতো না। দিবারাত্রির কাব্যে মনস্তত্ত্বের গহনলোকের রহস্যান্ধকারের উপর আলোকপাত বড় কম করা হয়নি, প্রেমকে যত বিভিন্ন কোণ থেকে দেখা সম্ভব উল্টেপাল্টে সোজাসুজিভাবে তেরছাভাবে কোণাকুণিভাবে—এ বইতে দেখা হয়েছে। চতুষ্কোণ ও দর্পণ উপন্যাসদ্বয়ে প্রকাশ পেয়েছে যৌন মনস্তত্ত্বের গহনলোকের ছায়া-মায়ার খেলা,

অহিংসা উপন্যাসে বিপিন ও সদানন্দের ভণ্ডামির মধ্য দিয়ে একদিকে করা হয়েছে ধর্মধ্বজিতার উপর নির্মম ব্যঙ্গ ও অন্যদিকে মহেশ চৌধুরীর চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে লৌকিক জীবনে "মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে, হিংসার সঙ্গে অহিংসাও যে মানুষের মধ্যে থাকে এবং এই সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিয়ে যে উপন্যাস লেখা যায়…" এটা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। (প্রতিবিম্ব উপন্যাসের ভূমিকায় 'লেখকের বক্তব্য' দ্রষ্টব্য।) মনস্তত্ত্বের খেলা সব কয়টি উপন্যাসেই কম-বেশী প্রকট, তবে পুতুল-নাচের ইতিকথার বেলায় ব্যতিক্রম করা কেন ?—তার দার্শনিক সুরের জন্য।

বলা প্রয়োজন, এ দার্শনিকতা কিতাব থেকে পাওয়া কর্ষিত দার্শনিকতা নয়, ভারতের সনাতন কৃষি জীবনের আওতায় লালিত প্রতি গ্রামীণ মানুষের মধ্যে যে সহজ দার্শনিকতা থাকে, তাকে শশী-কুসুম ও কমুদ-মতি, নন্দ-বিন্দু প্রমুখ চাষী স্তরের নরনারীগুলির ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে শিল্পীজনোচিত রূপ দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনী চলছে দুইটি স্তরে—একটি ব্যবহারিক জীবনের ঘটনার স্তরে, আরেকটি ভাবুকতার স্তরে। খতিয়ে দেখলে, ভাবুকতার স্তরের চিত্রণটাই সমধিক চিত্তাকর্ষক। তার কারণ আর কিছু নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সহজ ভাবুক মনের মানুষ—এত বেশী ভাবুক যে তাঁর এই ভাবুকতাকে একটা আবেশ বলে চিহ্নিত করা যায়—সারাক্ষণ চিন্তার আবেশে তিনি ডুবে থাকতেন। সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর মধ্যে কবিত্ব-গুণেরও সন্ধান পেয়েছেন। কবিত্ব তাঁর ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু সেটা সর্বাতিশায়ী ভাবুকতার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। আর এই ভাবুকতা থেকেই তাঁর স্বভাব-দার্শনিকতার জন্ম।

এই স্বভাব-দার্শনিকতার স্বরূপ কী ?—নিয়তিবাদ। বলা আবশ্যক যে, মানিক পরবর্তী-সময়ে মার্ক্সীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে যে অর্থনৈতিক নিয়তিবাদকে (economic determinism) তাঁর একটি মৌলিক প্রত্যয়-রূপে গ্রহণ করেছিলেন, এ সে-জাতের নিয়তিবাদ নয়। এ নিয়তিবাদের মূল ভারতীয় সনাতন সংস্কারে প্রোথিত, যা এদেশীয় কৃষকেরা অতীত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। পাশ্চাত্ত্যের পুরাতন ও আধুনিককালীন কোনো নিয়তিবাদের সঙ্গে যদি এর তুলনা দিতেই হয় তো গ্রীক নেমেসিস-এর ধারণা অথবা বিশ শতকের গোড়ার দিককার ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির নিয়তিবাদকে প্রতিতুলনা হিসাবে টানা যেতে পারে। কুসমের বাবা অনন্ত বলছে—"সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুলনাচের পুতুল

বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।" লেখকের নিজে জবানীতে পাচ্ছি—"নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনে স্রোত বহিতে পারে। মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজান শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।"

শশী গ্রামের ছেলে হলেও কলকাতায় গিয়ে ও কলকাতার মেডিকেল কলেজে পড়ে সে শহরের এক পোঁছ রঙ গায়ে লাগিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে কলকাতায় বন্ধু কুমুদের সান্নিধ্য তার মনোজগতের দুয়ার খুলে দিয়েছিল তার সংকীর্ণ চিন্তাভাবনার দিগন্তকে অনেক দূর প্রসারিত করেছিল। ফলে গাঁয়ে ডাক্তারি করতে বসে তার মন আর গাঁয়ে টিঁকতে চায় না। গাঁয়ের সংস্কারবদ্ধতায় ও অনৌদার্যে অল্পতেই মন হাঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু পরানের বউ কুসুমকে সে নীরবে ভালোবাসে। কুসুমের মানসিক স্তর আর তার মানসিক স্তরে প্রভূত ব্যবধান থাকলেও এবং সম্পর্কটা লৌকিক বিচারে অনৈতিক হলেও কুসুমের আকর্ষণে মুগ্ধ হতে তার আটকায় না। কারণ দুজনে গাঁয়ের আলো হাওয়ায় বড় হয়েছে, শহরের শিক্ষার পালিশ সত্ত্বেও কুসুমের মতই একই গ্রামীণতার সংস্কার তার ধমনীতে বহমান। তবু মাঝে মাঝে তার অন্তর বিদ্রোহ করে, গাওদিয়া গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছেড়ে বৃহত্তর পৃথিবীতে মুক্তি খোঁজার জন্যে তার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে। কিন্তু শেষ অবধি তার গ্রাম ছেড়ে যাওয়া হয় না, এক দুর্জ্ঞেয় নিয়তির টানে তাকে গাঁয়ের কূপমণ্ডুকতাতেই সংলগ্ন হয়ে থাকতে হয়। মানুষ যে ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক মাত্র, নিজ জীবনে তারই প্রমাণ বহন করে সে মনমরা হয়ে থাকে।

কিন্তু এই নিয়তিবাদ মানিককে বেশী কাল ধরে রাখতে পারেনি। তাঁর মত বলিষ্ঠ মনের মানুষ ভারতীয় নিয়তিবাদ বা অদৃষ্টবাদের অন্তর্নিহিত পরাজয় ও দুঃখবাদ কোনোমতেই স্বীকার করে নিতে পারে না। দেখা গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় থেকেই মানিকের এক বিস্ময়কর রূপান্তর—সংগ্রামী সাম্যবাদী তত্ত্বে আস্থা তাঁর গোত্রান্তর ঘটিয়ে দিয়ে গেল। সাম্যবাদী তত্ত্বে আস্থা তার অস্ফুট চেতনায় গোড়া থেকেই ছিল তার প্রমাণ পাই পদ্মানদীর মাঝি ও সহরতলী উপন্যাসদ্বয়ে কিন্তু তা তখনও পর্যন্ত একটা সুস্পষ্ট, দৃষ্টিগ্রাহ্য আকার লাভ করেনি; ধূসর নীহারিকাপুঞ্জের ধূম্রজাল বিস্তৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত থেকে অসংজ্ঞেয় ও অনির্ণেয় হয়েছিল। তিনি তখনও পথ হাতড়ে ফিরছিলেন এবং কখনও-কখনও ভুল পথে চলছিলেন। নইলে পুতুলনাচের ইতিকথার মত শিল্পগুণে অত্যুৎকৃষ্ট কিন্তু চিন্তাদর্শে প্রতিক্রিয়াশীল বই লেখা তাঁর পক্ষে

সম্ভব হতো না। মানুষ নিয়তির বশ হয়ে থাকবে কেন বরং নিজের ভাগ্য সে নিজেই গড়ে তুলতে পারে—এই তো আসল কথা, বীরের মত কথা। আর শুধু নিজের ব্যক্তি-ভাগ্য কেন, সে ইতিহাসের ভাগ্যকে পর্যন্ত বদলাবার ক্ষমতা রাখে এমন তার ইচ্ছাশক্তির জোর, কর্মের অমোঘতা। নিয়তিবাদ যদি মানতেই হয় তো অর্থনৈতিক নিয়তিবাদকেই মানতে হবে, পরাজিতের মনোভাবযুক্ত ভাববাদী নিয়তিবাদকে নয়, যে-নিয়তিবাদের প্রবক্তা ভারতীয় দর্শন, গ্রীক দর্শন, আধুনিক পশ্চিমী দুঃখবাদ, ইত্যাদি। কার্ল-মার্কস প্রচারিত অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বৈপ্লবিক রূপান্তর শুধু যে দুয়ে দুয়ে চারের মত আগে থেকেই অভ্রান্তভাবে বর্ণনা করে বলা যায় তা-ই নয়, তা ঘটানোও যায়, যদি এই ঘটানোর প্রকরণ জানা থাকে। মার্ক্সের দ্বন্দ্ববাদী পদ্ধতি হলো ওই প্রকরণ।

মার্ক্সীয় তত্ত্বে দীক্ষালাভের পর থেকে মানিকের রচনার ধারাধরন একেবারে বদলে গেল। এই পচা-গলা সমাজটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার চূর্ণাস্থির উপর নতুন সমাজসৌধ নির্মাণের জন্যে যে সংগ্রামশীলতা, আদর্শবাদ ও আত্মত্যাগ দরকার তার ডাক দিলেন এই নবীন বিশ্বাসে বলীয়ান, চরিত্রের তেজে দ্যুতিময় অসীমশক্তিধর লেখক। শুধু ডাক দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, নিজেও সংগ্রামের বর্ম পরলেন, লেখনীর মুখে ফোটালেন আদর্শবাদের জ্বলন্ত পাবক শিখা, জীবনে বরণ করলেন বহুবিধ লাঞ্ছনা দুঃখকষ্ট ত্যাগ, সংগ্রামী আদর্শে স্থিতপ্রত্যয় হওয়ার মূল্যস্বরূপ। চল্লিশের দশকের শেষার্ধে ও পঞ্চাশের দশকে যত গল্পোপন্যাস তিনি লিখেছেন তার মূল কথা: সংগ্রাম দ্বারা জীবনের রূপ বদলাও, লড়াই করে বিত্তবান শ্রেণীর অনিচ্ছুক হাত থেকে বাঁচার অধিকার ছিনিয়ে নাও। ওই যে সমুদ্রের স্বাদ গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯৪৭) ভূমিকায় মানিক লিখেছিলেন, "স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল—সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।" তারপর থেকে যত বই তিনি লিখেছেন তার সব কটিরই এই এক ধুয়া: সংগ্রাম দ্বারা সমাজের রূপ বদলাতে হবে।

কিন্তু এজন্য তাঁকে মূল্য বড় কম দিতে হয়নি। কায়েমী স্বার্থবাদী রক্ষণশীল সাহিত্যিক সমাজ মানিকের এই বিদ্রোহকে ক্ষমা করেনি, তাঁর সঙ্গে সর্বপ্রকারে অসহযোগ করে তাঁকে তাঁর অভীপ্সিত পথ থেকে স্খলিত করে পুনরায় পুরাতন-পরিচিত বর্ত্মে প্রত্যাবৃত্ত করবার সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেছে। তাই বলছিলাম

এই পর্বে মানিককে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে, গতানুগতিক মূল্যবোধে আস্থাশীল কায়েমী স্বার্থবাদী মানুষদের সম্মিলিত সঙ্ঘশক্তির বিরুদ্ধে, তার ছাপ তাঁর লেখার উপরে এসেও পড়েছিল। শেষ দিকে যেসব উপন্যাস তিনি লিখেছেন তার মধ্যে 'সোনার চেয়ে দামী' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কিন্তু অন্যান্য উপন্যাসে ক্লান্তির ছাপ লেগেছিল। 'ইতিকথার পরের কথা', 'শুভাশুভ' প্রভৃতি উপন্যাস এর প্রমাণ। এই পর্বে তিনি ভাল ছোটগল্প একাধিক লিখেছেন, যেমন 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'মাসিপিসি', হাবানের নাতজামাই ইত্যাদি কিন্তু উপন্যাসে দিবারাত্রির কাব্য পুতুলনাচের ইতিকথা প্রভৃতি বইয়ের শিল্পসৌন্দর্য আর ফিরে আসেনি। মানিকের শেষ পর্বের সৃষ্টিকর্মের ভিতর একটা গভীর আদর্শবাদী, প্রত্যয়, 'সমাজবাদী বাস্তবতার' চিত্রণ ছাড়া সাহিত্যকে আর কোন কাজে লাগাবো না জাতীয় একটা স্থির সংকল্প, অবিকম্প প্রদীপশিখার ভাস্বর দ্যুতির মত জলজ্বল করছে কিন্তু সৃষ্টির স্ফূর্তি তাতে মিইয়ে এসেছিল। বিরুদ্ধ প্রতিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে প্রভূত শক্তিক্ষয় তাঁর হয়েছে, ওই অপরিমিত শক্তিক্ষয়ের আবহাওয়ায় সৃষ্টির পূর্বতন প্রাণোচ্ছলতা কি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব ?

কিন্তু বিষয়টিকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখলে, এ ভালোই হয়েছিল বলতে হবে। মানিকের পূর্বযুগের রচনাবলী যতই সৃষ্টিলক্ষণাক্রান্ত আর শিল্পসৌন্দর্যের চিহ্নভূষিত হোক, একথা ভুললে চলবে না যে, তাঁর ওই সময়ের রচনায় যে-মন প্রতিফলিত হয়েছে তা অত্যন্ত জটিল কুটিল বক্র এক মন। সংগ্রামের পথে নামার পর থেকে তাঁর মনের ওই বক্রতা কুটিলতা 'মর্বিড' চিন্তার ছাঁচ বহুলাংশে দূর হয়ে গিয়েছিল। তিনি খেটেখাওয়া মেহনতী মানুষের সুখদুঃখের শরিক হয়ে তাদের সোজা পথের পথিক হয়েছিলেন। 'ভদ্রলোকী' সাহিত্যের শৌখীনতা তাঁর কলম থেকে মুছে গিয়েছিল। অনেকটা টলস্টয়ের শেষ বয়সের লেখার মত তিনি তাঁর লেখা থেকে উপরতলার শিল্পীসমাজসুলভ মেকিত্ব আর কৃত্রিমতাকে বিদায় দিয়েছিলেন। এটা যে একটা মস্ত বড় লাভ তা স্বীকার করতেই হবে।

মানিক সাহিত্যে বাস্তবতা

প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পোপন্যাস পাঠের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আমার জনৈকা প্রীতিভাজনা আত্মীয়া আমাকে বলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পোপন্যাস পড়ে তিনি তেমন সুখ পান না, তাঁর কেবলই মনে হয় মানিকের সৃষ্ট জগৎ বড়ই শুষ্ক, রুক্ষ, নিষ্করুণ—তাঁর কোন কোন গল্প বা উপন্যাস পড়তে গিয়ে রীতিমত হাঁফ ধরে যায়, শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়, বর্ণিত ঘটনাবলী কিংবা চরিত্রায়ণের ছাঁচ এমন যে সেগুলির চাপে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবার দাখিল হয়। বাংলা ভাষার অন্যান্য কথাসাহিত্যিকেরা সকলে না হলেও অনেকেই কেমন নিটোল-সুগোল সুবলয়িত কাহিনীর আশ্রয়ে তাঁদের গল্প-উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ করেন, আর এই লেখক কিনা সেই জায়গায় কেবলই ভাঙাচোরা জরাজীর্ণ এবড়ো-খেবড়ো সমাজ-সংসারের কথা লিখে পাঠক্রিয়ায় তিক্ত স্বাদ এনে দেন অন্তরে বার বার বিষাদ ও অবসাদের সৃষ্টি করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য পড়া নয় তো তেতো পিল গেলা—সাধ করে কেন পাঠক এমনতর নিরানন্দ আবহের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিতে রাজী হবেন ?

আমি বিক্ষুব্ধা আত্মীয়াটির প্রশ্নের জবাবে স্নেহভরে বলি, ললনাকুল সচরাচর গল্পোপন্যাস পড়তে ভালবাসেন এ তথ্য আমি অবগত আছি, এমন কি মনের মত গল্পের বই পেলে তার ওপর তাঁরা হুমড়ি খেয়ে পড়েন এবং তাঁর পাঠ্যবস্তু গোগ্রাসে গেলেন এ সংবাদও আমার অজানা নয়। তা বলে সব লেখক কি সব পাঠকের জন্য সমান উদ্দিষ্ট ? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁদের জন্য লেখেন তাঁরা সমাজ ও মনুষ্যজীবন সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে এসেছেন, তাঁদের চোখের উপর থেকে রঙীন চশমার পরকলা খসে গেছে, 'মেকবিলিভ' জগতের মিথ্যামোহ দিয়ে তাঁদের মন ভোলানো কঠিন। তাঁরা আমাদের বাঙালী মধ্যবিত্ত তথাকথিত 'ভদ্রলোগ' শ্রেণীর ফাঁকি ও মেকির ভড়ং-সর্বস্বতাটাকে ধরে ফেলেছেন, তাঁদের কি আর পুতু-পতু গল্পকাহিনীর চুষিকাঠি দিয়ে মজিয়ে রাখা সম্ভব ?

পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁদের মন থেকে অবাস্তব স্বপ্নালুতার আবরণ খসে গেছে, যাঁরা সমাজের চল্‌টা-ওঠা পলেস্তারা-ঝরে-পড়া বিবর্ণ-মলিন আসল চেহারাটা দেখে আর অনভ্যস্ত পাঠক-পাঠিকার মত আঁতকে ওঠেন না, তাঁরাই হলেন মানিক-সাহিত্যের যোগ্য পাঠক। 'ললিপপ'-চোষা ঝুমঝুমি পেয়ে

অল্পতেই খুশী-হয়ে-ওঠা পাঠক-পাঠিকাদের জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নন। বিশেষ, যে-সমস্ত বঙ্গললনা গল্পোপন্যাসকে দুপুরের ঘুমের ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করেন তাঁদের জন্য তো আদপেই নন।

মানিক-সাহিত্য পড়তে হলে পিঠ খাড়া করে পড়তে হয়—আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে শিরদাঁড়া শিথিল ভঙ্গীতে নমনীয় করে পড়বার সাহিত্য মানিক-সাহিত্য নয়।

মুষ্টিমেয় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে আমাদের ভাষার বেশীর ভাগ গল্প-উপন্যাসের লেখকই সমাজের বহিরঙ্গ রূপের রূপকার; সমাজের ভিতরকার খাঁটি চেহারাটা হয় তাঁদের চোখে পড়ে না, নয় চোখে পড়লেও সেটা তাঁরা এড়িয়ে যান। তাঁরা সমাজের বহিঃপৃষ্ঠভাগের সবাকার চক্ষুগোচর অংশটাকেই তাঁদের কথাসাহিত্যের অবয়বের ভিতর রূপ দিতে ভালবাসেন, কারণ তাঁদের পাঠক-পাঠিকারা সমাজের এই উপরিতলের রূপটা দেখতেই সচরাচর অভ্যস্ত, ওই রূপের অন্তরালবর্তী নগ্ন কঠিন সত্যের চেহারাটা সম্বন্ধে তাঁরা কম বেশী অজ্ঞ। তাঁদের অনভিজ্ঞ চেতনায় ওই সত্যের বোধ খুবই অস্পষ্ট। সুতরাং এমন পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সত্যনিষ্ঠ তথা দুর্মরবাস্তববাদী মানিক-সাহিত্য যে তেমন ভাল লাগবে না এ তো সহজেই বোঝা যায়।

মানিক-সাহিত্য 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম' অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্য। এ সাহিত্যের পাঠক ক্রমশঃ তৈরী হচ্ছে—এখনও এ সাহিত্যে ধাতস্থ হওয়ার মত মানসিকতাসম্পন্ন পাঠক কাঁড়ি-কাঁড়ি সৃষ্টি হচ্ছে না তার কারণ কায়েমীস্বার্থবাদী শ্রেণী সমাজের প্রকৃত চেহারাটা পাঠককে দেখতে দিতে চায় না এবং যাতে পাঠক সেটা না দেখে তার জন্য নানা মত আয়োজনে ব্যস্ত। অচেতন, আধা-অচেতন কথাশিল্পীরা এই শ্রেণীর লোকদের হাতের ক্রীড়নকস্বরূপ, তাঁরা সত্যভিত্তিবর্জিত বস্তুসারহীন অবাস্তব সাহিত্য সৃষ্টি করে জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে কায়েমীস্বার্থওয়ালাদেরই হাত পুষ্ট করেন মাত্র। যেসব লেখক স্থিতাবস্থা সংরক্ষণের সহায় তাঁদের লেখনীতে কি সমাজের প্রকৃত রূপ কখনও উদ্‌ঘাটিত হতে পারে?

আরও একটি কথা এ প্রসঙ্গে ভাববার আছে। মানিক-সাহিত্যের মূল্যায়নে কথাটা খুবই জরুরী।

সেটা এই যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট শিল্পের জগৎ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট শিল্পের জগৎ থেকে একেবারেই আলাদা। শুধু আলাদা বললে কমই বলা হয়, বলা উচিত বিপরীত। রবীন্দ্রনাথের বুর্জোয়া মূল্যবোধের

জগতের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্ট ও সৃষ্ট জগতের আদৌ কোন মিল নেই বরং বেমিল ষোল-আনা। কোন কোন নবীন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের প্রতি আনুগত্যের উচ্ছ্বাসবশতঃ বলেন, মানিকের লিপিভঙ্গী নাকি কবির লিপিভঙ্গীর দ্বারা সাক্ষাৎভাবে প্রভাবিত এবং মানিক নাকি রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরসাধক। এ মন্তব্য মোটেই ঠিক নয়। বরং সত্য ঠিক তার উল্টো। আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের জগৎ থেকে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থানকারী লেখক যদি কেউ থেকে থাকেন তো তিনি হলেন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাদে গন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীতে স্টাইল-প্রকরণে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে মানিক-সাহিত্যের কোন সাদৃশ্যই নেই। একজন আরেকজন থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত কোটিতে বিরাজ করছেন।

এ রকমটা হওয়াই প্রত্যাশিত কারণ রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া মূল্যবোধে আস্থাশীল মূলতঃ মানবতাবাদী ঘরানার শিল্পী, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বহারা নিঃস্ব জনদের ধ্যান-ধারণার শিল্পী। দুয়ের মধ্যে মিল হওয়া কেমন করে সম্ভব?

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উঁচুদরের শিল্পী, তাঁর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের আর কারও কোন তুলনাই হয় না একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন ছাড়া। বিশ্বসাহিত্যেও তাঁর সমশ্রেণীর শক্তি ও প্রতিভা সম্পন্ন কবি মুষ্টিমেয় সংখ্যক মাত্র জন্মেছেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচ্যে প্রতিভার বড়-ছোটর তুলনামূলক পর্যালোচনা হচ্ছে না, হচ্ছে মেজাজ-মর্জির পার্থক্য নিরূপণের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট দুই লেখকের বৈশিষ্ট্য খতিয়ে দেখার আলোচনা। এই মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন তা কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার মত জিনিস? এই পার্থক্য কি স্বতঃসিদ্ধ নয়?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বসূরী কথাশিল্পীদের মধ্যে এক বা একাধিক জন কারও দ্বারা যদি প্রভাবিত হয়ে থাকেন তবে তাঁরা হলেন—জগদীশ গুপ্ত, পটলডাঙ্গার পাঁচালীর স্রষ্টা 'যুবনাশ্ব' এবং অবশ্যই শরৎচন্দ্র। এঁদের ভিতর শরৎচন্দ্রের কাছেই তাঁর ঋণ সবচেয়ে বেশী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখকের কথায় স্বমুখে স্বীকার করেছেন শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস তিনি কমপক্ষে ছ'বার তন্ন তন্ন করে পড়েছেন। আর সাধারণভাবে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকদের প্রভাব যে তাঁর উপর বিশেষভাবেই বর্তিয়েছিল মানিক-সাহিত্যের পূর্বাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসগুলির ভিতর তার আভ্যন্তর প্রমাণ অনেক আছে।

তবে কল্লোলের প্রভাব যে তাঁর লেখায় সবসময় শুভংকর হয়েছে তা বলা যায় না। কল্লোলীয় লেখকগোষ্ঠীর অনুশীলিত ফ্রয়েডীয় 'লিবিডো' তত্ত্ব

মানিকের গল্পে উপন্যাসে ক্ষতিকর প্রভাবই বিস্তার করেছে একটা পর্বে যখন তাঁর আরও সচেতন হয়ে এই প্রভাবের পেছুটান তাঁর লেখা থেকে সবলে ঝেড়ে ফেলা উচিত ছিল জনগণের মুখ চেয়ে। যে অত্যাচারিত ও শোষিত জনজীবনের স্বার্থেব সেবায় মানিকের উত্তরপর্বের লেখনী বিনিঃশেষে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল, সেই জনজীবন শিল্পচর্চার প্রথম অধ্যায়ে মানিকের চোখের সামনে সবসময় দৃশ্যমাণভাবে বিরাজিত ছিল এমন কথা বলা যায় না। যৌন কামনা-বাসনার প্রসুপ্ত শক্তির লীলা ও ব্যক্তির নির্জ্জান মনের উপর তার সাংঘাতিক প্রভাবের চিত্র তিনি তাঁর প্রথম বয়সের লেখায় এতবেশী ও এত ঘন ঘন ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন যে, ওই ফ্রয়েডীয় অনুশীলনীর আতিশয্যের তলায় জনকল্যাণ অনেক সময় শোচনীয়ভাবে চাপা পড়ে গেছে। তাতে শিল্পের সত্যের মান হয়ত রক্ষা পেয়েছে কিন্তু শিবের মর্যাদা রক্ষা পায় নি। জনস্বার্থ রক্ষা পায় নি। জনস্বার্থ এখানে স্পষ্টতই ভূলুণ্ঠিত।

এ বিষয়টি ঢালাও মন্তব্যের আকারে না বলে দৃষ্টান্ত সহযোগে বললে সমধিক প্রতীতিযোগ্য হয়। তাই এবারে উদাহরণ সন্ধানের চেষ্টা করব এবং তার সাহায্যে বিষয়টির পরিস্ফুটনে যত্নবান হব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বয়সের ছোট গল্প বড় উপন্যাস যা-ই ধরা যাক না কেন তার মধ্যে বড্ড বেশী কামায়নের ছাপ। যেমন 'প্রাগৈতিহাসিক', 'শৈলজা শিলা', 'সরীসৃপ', 'ভয়ঙ্কর', 'রোমান্স' প্রভৃতি ছোট গল্প ; 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) প্রভৃতি উপন্যাস। এমন কি 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) নামক সুপরিচিত উপন্যাসটিও এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এর পরবর্তীকালের 'বৌ' পর্যায়ের গল্পগুলি সম্বন্ধেও একই কথা। এমন কি আরও পরেকার লেখা 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮) উপন্যাস সুস্পষ্টতই তার কলেবরে প্রথম বয়সের ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের ছাপ বহন করছে। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত 'আরোগ্য' উপন্যাসটিও এ কথার ব্যতিক্রম নয়। সেখানেও দেখি উপন্যাসের মূলচরিত্র কেশব ড্রাইভারের উপর কামায়ন জনিত মনোবিকারের প্রভাব।

যে-পর্বের লেখায় মানিক ফ্রয়েডীয় অপবিজ্ঞানের প্রভাব কাটিয়ে উঠে সুস্থ-সুন্দর মার্কসীয় চিন্তা-চেতনায় দীক্ষা নিয়েছেন তখনও যে তাঁর রচনায় অতীতের জের স্বরূপে একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্জ্জান কামনা-বাসনার দুর্মর প্রভাবের ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রবণতা একেবারে লোপ পায়নি এতেই প্রমাণ অভ্যাস মরেও মরতে চায় না, স্বভাব থেকে তার জড় নিশ্চিহ্ন করা বড় কঠিন। নইলে মানিক

যখন তাঁর সাহিত্যে সমষ্টিগত মানুষের জয়গানে মুখর তখনও কেন তাঁর লেখায় এই পুরনো অভ্যাসের পেছুটান ?

কিন্তু সব জড়িয়ে মানিক-সাহিত্য বিচার করলে দেখা যায় মানিক আস্তে আস্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সমষ্টিগত জীবনের অভিমুখে তাঁর লেখনীর মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছেন এবং ধীরে ধীরে ওই পথে সুনিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন। ফ্রয়েড ক্রমশঃ দৃশ্যের অন্তরালে চলে যাচ্ছে, তাঁর চেতনায় জ্বলে উঠছে মার্কসীয় বিজ্ঞানের প্রাণপ্রদায়িনী শক্তির তত্ত্বে অভ্রান্ত বিশ্বাসের দীপ্ত শিখা। ফ্রয়েড মুছে যাচ্ছে, মার্কস জেগে উঠেছে।

এখানে এ দুটি শব্দ ব্যক্তির প্রতীক নয়, প্রত্যয়ের প্রতীক।

'সহরতলী' উপন্যাস দুই খণ্ড (১৯৪০-৪১) থেকেই এই নয়া প্রত্যয়ের জয়যাত্রার শুরু। তা আরও জোরালো রূপ পেল 'দর্পণ' (১৯৪৫) উপন্যাসে, 'সোনার চেয়ে দামী' উপন্যাস দুই খণ্ডে (১৯৫১-৫২), 'চিহ্ন' (১৯৪৭) ও 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১) নামক দুটি উপন্যাসিকায় এবং শেষ বয়সের লেখা অসংখ্য ছোটগল্পের ভিতর। ছোটগল্পগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য—দুঃশাসনীয়, ফেরিওয়ালা, হারানের নাতজামাই, পেটব্যথা, শিল্পী, কংক্রীট, মাসিপিসি, টিচার, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, প্রভৃতি।

এ সব লেখার উদাহরণ থেকে আরও আমরা বুঝতে শিখি যে, যতদিন পর্যন্ত মানুষ আত্মকেন্দ্রিকতার অভিশাপে আবদ্ধ থাকে ততদিন পর্যন্ত অন্ধকার জীবন থেকে তার মুক্তি নেই, প্রবৃত্তির তাড়নায় ও স্বার্থমগ্নতার আবেশে তার ব্যক্তিত্বের অধোগামিতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যেইমাত্র মানুষ নিজের ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা আর কামনার পাক থেকে মুক্ত হয়ে সমষ্টিবদ্ধ জীবনের সঙ্গে আপন ভাগ্যকে মেলায়, অমনি তার উত্তরণ ঘটে। তার জীবন থেকে আঁধার-কালিমা অপসৃত হয়ে গিয়ে রৌদ্রালোক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেই আলোকে সে নিজেও আলোকিত হয়, চারপাশের মানুষগুলিও আলোকিত হয়। সঙ্ঘবদ্ধ সামূহিক জীবনই সমস্ত ব্যাধির মহৌষধ।

মানিক চিন্তার ও অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ঘটিয়ে সমৃদ্ধতর জ্ঞানের প্রভায় দীপ্ত হয়ে সাহিত্য সাধনার পথে যত অগ্রসর হতে থাকেন তত তাঁর প্রাণ ও মন থেকে আত্মরতির আবেশ মুছে যেতে থাকে, তার বদলে সেখানে জেগে ওঠে বহু মানুষকে নিয়ে একত্রে পথচলার সুস্থ আকাঙ্ক্ষার সজীবতা। ব্যক্তিকেন্দ্রিক অন্তর্নিবেশের মারাত্মক প্রবণতা থেকে এ যেন সুস্থ বহির্মুখীনতার অভিমুখে অভিসারের তুল্য এক অনুকরণযোগ্য প্রক্রিয়া।

বহির্মুখীনতাকে সচরাচর আমরা স্থূল প্রক্রিয়া বলে মনে করি। সেই তুলনায় অন্তর্মুখীনতাকে অনেক বেশী সম্মান দিই—ভাবি এর মধ্যে এমন একটা শ্লাঘ্য সূক্ষ্মতা আছে যা শিল্পীমাত্রেরই চর্চাযোগ্য বিষয়। কিন্তু এ কথা আমরা খেয়াল করি না যে, এই-জাতীয় সূক্ষ্মতার রন্ধ্রপথেই রোমান্টিক স্বেচ্ছাচারের কলি শিল্পের দেহে প্রবেশ করে বহুবিধ অনর্থ ঘটিয়ে শিল্পকর্মের উৎকর্ষ নষ্ট করে। মানিক তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম দিকে জেনেশুনে নিজেকে এই রোমান্টিক স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হতে দিয়েছিলেন। 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' প্রভৃতি অন্যথা-শক্তিমত্তার লক্ষণ মণ্ডিত সৃষ্টিগুলি এই স্বেচ্ছাচারেরই ফল। কিন্তু যখন থেকে তিনি সচেতন এক আত্মশোধনীর অঙ্গ হিসাবে বহু মানুষকে তাঁর চলার পথের সাথী করে নিয়ে বহির্মুখীনতার 'রূপনারায়ণের কূলে' জেগে উঠলেন তখন থেকে তাঁর সাহিত্যের আর এক রূপ। এখন থেকে তাঁর সাহিত্য প্রখর রৌদ্রচ্ছটায় সমুজ্জ্বল, বিবরের অন্ধকার আর সেখানে নেই। নির্জ্ঞান, স্বচ্ছ জ্ঞানকে পথ করে দিয়ে আত্ম-অবলোপের অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে।

ফ্রয়েডবাদ থেকে মার্কসবাদে উত্তরণ বুঝি একেই বলে। এই বিবর্তনের তত্ত্বটি ভাল না বুঝলে মানিক-সাহিত্যের তাৎপর্য সঠিক বোঝা যাবে না।

বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের পচা-গলা লঝ্ঝর চেহারাটা মানিক তাঁর সাহিত্যে চূড়ান্ত দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন এমন কথার আভাস গোড়াতেই দিয়েছি। যেজন্য সমাজের উপরিতলদর্শী পাঠক-পাঠিকার দল তাঁর সাহিত্য পাঠে এক ধরনের অস্বস্তি ও মানসিক ক্লেশ অনুভব করেন যা তাঁদের অভিজ্ঞতার স্বল্পতাকেই সূচিত করে। তাঁদের কম-বেশী অচেতনতায় তাঁরা এত বেশী কঠিন বাস্তবতার চাপ সইতে পারেন না, সমাজের নগ্ন-নিরাবরণ ক্ষতমুখে পুঁজ-রক্ত-ঝরা কুৎসিত ঘাযুক্ত আসল চেহারাটা দেখার ফলে তাঁদের মনের শান্তি দেহের আরাম দুই-ই ঘুচে যাবার উপক্রম হয়।

কিন্তু মানিক উদ্দেশ্যহীনভাবে এ কাজ করেননি। কিংবা নিছক দুঃখ-বিলাসের জন্যই দুঃখবিলাসে মেতে ওঠার ঝোঁকে তাঁর এ বাস্তবচর্চা নয়। 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩) বইয়ের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলেছেন পাঠককে দর্পণে তাঁর নিজের মুখ দেখিয়ে ঘা মেরে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই তাঁর স্বরূপের অন্বেষণ এবং সেই অন্বেষার ফলশ্রুতিতে এ-জাতীয় শিল্পসৃষ্টি। এর উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার নড়বড়ে কাঠামোটার বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে তাকে একেবারে গুঁড়িয়ে ফেলার প্রেরণা জাগানো এবং তার চূর্ণাস্থির

উপর নতুন সমাজসৌধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো—এমন সমাজসৌধ যা সাম্যের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকলের প্রতি সমান সুবিচারের নীতিতে দৃঢ়মূল।

ইউরোপীয় সাহিত্যে গর্কির 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম' তত্ত্ব প্রবর্তিত হওয়ার আগের ধাপে 'ক্রিটিকাল রিয়ালিজম' নামে একটি সাহিত্যাদর্শ ফরাসীদেশে বেশ কিছুকাল ধরে তথাকার লেখকদের মন জুড়ে ছিল। 'ক্রিটিকাল রিয়ালিজম' সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কথা বলে না বটে তবে ওই দিকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ তৈরী নিশ্চয়ই কিছু পরিমাণে করে। এই তত্ত্বের মূল কথা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে তাকে ধ্বংস করার মন্ত্রণা জোগানো। মানিক এ কাজটি তাঁর সাহিত্যে বিধিমতেই করেছিলেন, করে এ দেশে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পথ প্রস্তুত করেছিলেন। ভারতীয় কথাসাহিত্যে মুন্সী প্রেমচাঁদ আর মানিক এ দুজনই এ কাজের পথিকৃৎ।

শেষের দিকের লেখায় মানিকের চিন্তা-চেতনা যে কতবেশী গণমুখী হয়ে উঠেছিল তার নিদর্শন স্বরূপে উত্তরকালীন উপন্যাস থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে উৎকলন করা যেতে পারে। তা থেকে মানিকের শিল্পজীবনের বিবর্তনের ছকটি স্পষ্ট ধরা পড়বে বলে মনে করি।

"মানুষের জীবনকে যারা ব্যাহত ও ব্যর্থ করে রাখে, কেবল তাদের ছাড়া সংসারে কোন মানুষকে বাজে ভাবা যায় না, ছোট ভাবা যায় না, ঘেন্না করা চলে না। সংসারে গলদ থাকলে মানুষের মধ্যে গলদ থাকবে না? সংসারে মহৎ মানুষ বীর মানুষ এগোনো মানুষ আছে বলেই হীন মানুষ ভীরু মানুষ পিছোনো মানুষ অমানুষ হয়ে যায় না। জোর করে তাকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে, মহৎ মানুষ বীর মানুষ এগোনো মানুষ হতে দেওয়া হয়নি—এ অপরাধ তাদের নয়। একজনের একটা দোষ আছে বলেই তার গুণটা বাতিল হয়ে যায় না।" (আরোগ্য, ১৯৫৩, মানিক গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪৮৮)।

"দশটা মানুষের জীবনের সুখদুঃখের অংশীদার হলে, দশজনের লড়াইয়ে ভাগ নিলে জীবন বেশ জমে যায়।"

(পরমেশ্বর, সর্বজনীন, ১৯৫২, মানিক গ্রন্থাবলী পৃঃ ১৮০)।

"শ্রেণীবিভক্ত জীবন কোন দেশে কস্মিন কালে প্যারালাল বা সমান্তরাল ছিল না, এখনও নেই, সোনার পাথরবাটির মতোই সেটা অসম্ভব ব্যাপার।"

"কথাটা ভুল বোঝা সম্ভব—আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করি। আমি বলছি জীবনের কথা—শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ হয়ে হয়েও একত্র সংগঠিত সমগ্র জীবনের

কথা। সমান্তরাল কাহিনী খুবই সম্ভব, একটু কায়দা করে বানিয়ে লিখলেই হলো—কিন্তু সম্পর্কহীন সমান্তরাল জীবন ?”

“সম্পর্ক কি শুধু প্রেমে হয় ? সংঘাত সম্পর্ক নয় ?” (হলুদ নদী সবুজ বন, ১৯৫৬)।

“তবে কিনা মানুষ কখনো হার মানে না। ভুল সামলে নতুন পথে যাত্রা করে।” (মাশুল, ১৯৫৬)।

এরকম উদ্ধৃতি আরও দেওয়া যায়। কিন্তু উদ্ধৃতি দিয়ে শিল্পের শিল্পত্ব বোঝানো যায় না, লেখকের চিন্তার গতিমুখটাকেই শুধু নির্দেশ করা চলে। মানিকের শিল্পের উৎকর্ষ তাঁব বইগুলিতে স্বপ্রকাশ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর সামান্যই প্রকট হওয়া সম্ভব।

ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য

দীর্ঘাকৃতি চেহারা, লম্বায় ছ'ফুটেরও উপরে, গায়ের রঙ কালো, দোহারা গড়ন, মাথার চুল অবিন্যস্ত, মুখের ভাবে ঋজু কাঠিন্য, চোখের দৃষ্টি প্রখর—এই হলো সংক্ষেপে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহগঠনের বৈশিষ্ট্য। শিল্পীদের চেহারা সাধারণতঃ যে রকমের হয়ে থাকে—মুখের রেখায় নরম কোমল আদল, চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্নালুতা, বড় বড় এলানো চুল, চালচলনে সযত্ন ঔদাস্য, কথায় বার্তায় মার্জিত উচ্চারণের পালিশ—এ সবের সঙ্গে এ মানুষটির ধরন-ধারণ, করণ-কারণ, চলন-বলনের আদৌ কোনও মিল নেই। বরং দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে কাঠখোট্টা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। চোখের ও মুখের রেখার কাঠিন্য মানুষজনকে ঘনিষ্ঠ হতে আমন্ত্রণ জানায় না, উল্টো, প্রতিহতই করে। আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণেরই ভাব জাগায় বেশি।

কথায় বার্তায়ও তেমনি ঠোঁটকাটা ভাব, যা কখনও কখনও রূঢ়তার ধার ঘেঁসে যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' স্মৃতিকথায় একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যার থেকে মানিকের স্বভাবের এই দিক্‌টার অর্থাৎ তাঁর পরুষভাষিতার কিছু আভাষ মেলে। তারাশঙ্কর পরে তাঁর 'মহানগরী' উপন্যাসে একই ঘটনাকে নাম আড়াল করে বর্ণনা করেছেন কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না মানিকই তাঁর বর্ণনার লক্ষ্য। এই ঘটনার বর্ণনায় মানিকের যে-রূপ ফুটে উঠেছে তাকে শুধু কাঠখোট্টা বললেই যথেষ্ট বলা হয় না, বলা উচিত কতকটা বা চোয়াড়ে। একবার ট্রাম ভ্রমণ উপলক্ষে কোনও এক ট্রাম-কণ্ডাক্টরের সঙ্গে বচসা হয়, বচসা নিছক কথাকাটাকাটিতেই সীমিত থাকেনি, হাতাহাতি পর্যন্ত গিয়ে পেঁৗছেছিল, যার উল্লেখ পাওয়া যায় ডক্টর সরোজমোহন মিত্রের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য' বইয়েব জীবনী অংশে। মানিক স্বয়ং তাঁর আত্মকথায় কবুল করেছেন প্রকাশকের কাছে পাওনা থাকলে তিনি প্রয়োজন হলে গলায় গামছা দিয়ে সে টাকা আদায় করতে পেছপা হতেন না।

আকৃতি ও আচরণ গত এইসব বিবরণ থেকে মনে হতে পারে মানুষটা ছিলেন প্রেমহীন—ভব্যতা ও শিষ্টতা বর্জিত এক চাঁচাছোলা উদ্ধত প্রকৃতির ব্যক্তি। কিন্তু যাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুব কাছে থেকে দেখেছেন ও তাঁর সাহিত্যোব সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁরা জানেন মানিক একেবারেই বিপরীত স্বভাবের লোক ছিলেন। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অন্তহীন ভালবাসা;

বিশেষ, নির্ধাতিত ও শোষিত স্তরের ভাগ্যহত লোকজনের প্রতি তাঁর দরদের সীমা-পরিসীমা ছিল না। স্বীয় সাহিত্য কর্মকে দলিত-বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের দুঃখ-বেদনার উপযুক্ত ভাবপ্রকাশক সৃষ্টি-মাধ্যমে পরিণত করে তোলার জন্য তাঁর নিরন্তর প্রয়াস ও অশ্রান্ত যত্ন লেখক হিসাবে নম্র-বিনীত সত্তার প্রতিই অঙ্গুলিক্ষেপ করে, তাঁকে অশিষ্ট বলে আদৌ চিহ্নিত করে না। নিজের লেখাকে সর্বপ্রকার ফাঁকি ও মেকি থেকে মুক্ত করবার জন্য নিজের উপর সতত যে ক্ষমাহীন দাবির বহর চাপাতেন তিনি তার থেকে তাঁর সত্যনিষ্ঠ প্রকৃতি, আন্তরিকতা মণ্ডিত স্বভাব ও নিজের ভুলত্রুটি সম্পর্কে সচেতন এক আত্ম-সমালোচক সত্তার পরিচয়টাই সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'লেখকের কথা' বইতে নিজের লেখাকে উত্তরোত্তর সত্যময় করে তোলবার জন্য, অর্থাৎ জনজীবনের ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর নৈকট্যে উন্নীত করবার জন্য যে-অবিরত আত্মপরীক্ষার মধ্যে ছিলেন ও সর্বদা অতৃপ্তির যন্ত্রণায় ভুগতেন তার কথা লিখেছেন। এ তাঁর যথার্থ শিল্পীজনোচিত স্বভাবের ইঙ্গিত দেয় ও তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর সত্যানুরাগীর মর্যাদায় ভূষিত করে। সরোজবাবুর বইয়ের বিবরণ থেকে পাই, যে-মানুষকে বহিরঙ্গ বিচারে রুক্ষকঠোর বলে মনে হতো সেই মানুষই তাঁর আপন লেখা গল্প ও উপন্যাসের অনুকূল সমালোচনা সোভিয়েত সুহৃদ্ সঙ্ঘ ও প্রগতি লেখক সঙ্ঘের বৈঠকাদিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপার ধৈর্য ও বিনয়ের সঙ্গে শুনতেন। সমালোচকের বিরূপ মন্তব্যে চটে যেতেন না বরং সমালোচকের বক্তব্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করতেন এবং তাঁর সমালোচনায় প্রণিধানযোগ্য কিছু থাকলে তাকে গ্রহণ করতেন। নিজের ভুলত্রুটি শোধরাবার জন্য তাঁর বিরামহীন চেষ্টা ও সদাসজাগ দৃষ্টি তাঁর এমনই একটি সত্তার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করায় যাতে করে তাঁকে একজন অবিশ্রাম যত্নপ্রয়াসী পরীক্ষাপাসে বদ্ধপরিকর স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে তুলনা করতে সাধ জাগে।

এই অপার নম্রতা ও বিনয় কি তারাশঙ্কর বর্ণিত ঘটনার ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মেলে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাহ্যিক চলনে-বলনে কথায় আলাপে সব সময় হয়ত প্রচলিত সমাজ ব্যবহারের 'নর্ম' মানতেন না, তা বলে তাঁকে কি সংবেদনশীলতার অভাবের দায়ে দোষী করা যায়? এত বড় যিনি লেখক তাঁর বাইরেটা যেমনই হোক অন্তরের গভীরে অনুভূতির অতলতা না থেকে কি পারে? বাইরে তিনি কখনও-কখনও আপাতরূঢ়তার নির্মোক ধারণ করতেন কিন্তু সে শুধু এই হৃদয়হীন ক্রুর সংসারের আত্মীয়তার ছাপ বর্জিত

শুষ্ক পরিবেশের নিষ্করুণোর ভিতর প্রাণান্তিক আত্মরক্ষায় তাগিদেই। সময় বিশেষে এই সমাজে পরকে ঘা না দিয়ে চলা যায় না। এই অসুস্থ ও অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা তাড়িত সংসারে সকলেই যেথানে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির আশায় উদ্দাম বেগে ধেয়ে চলেছে, অপরের পায়ের কড়া না মাড়িয়ে যেথানে চলার উপায় নেই, এমন কি পরকে ল্যাং মারতেও আটকায় না; সেস্থলে নিছক টিকে থাকার গরজেই সময় সময় প্রত্যাঘাত করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মানিককেও সম্ভবতঃ এই প্রয়োজনেই মাঝেমধ্যে রূঢ়ভাষী হতে হয়েছে। তিনি নিজেই লিখেছেন, র‍্যাশন না তুললে যে-লেখকের সংসারে পরের দিন হাঁড়ি চড়বে না, সে-লেখকের পাওনা নিয়ে 'আজ-নয়-কাল' গড়িমসি করা প্রকাশকের সঙ্গে মিষ্ট-মধুর বিশ্রম্ভালাপের চালে কথা বলা সাজে না। তাঁকে আবশ্যকমত নরম-গরম দু চারটে কথা শুনিয়ে দিতে হয়ই। প্রয়োজনে হক্ কথা শুনিয়ে দেবার মত ক্ষমতা যে-কোন অভাবগ্রস্ত লোকেরই থাকা উচিত। মানিক অভাবগ্রস্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁর বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবার কোন কারণ ছিল না।

আসলে এই অসামান্য স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত লেখকটি প্রকৃতিতে ছিলেন রোমান্টিক মানসিকতার ঘোরতর বৈরী। তাই কি প্রচলিত লোক-ব্যবহারে কি সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি সুযোগ পেলেই রোমান্টিক ধাত-ধরনের বিরোধী মনোভাবের আনুকূল্য করতেন। তেমন প্রয়োজন দেখা দিলে রোমান্টিক মানসপ্রবণতার পর্দা দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলতেও ইতস্ততঃ করতেন না। এই সমাজের বাহ্য রূপ যেমনই হোক, তার ভিতরকার প্রকৃত চেহারা জানতে তাঁর বাকী ছিল না। বিশেষতঃ যে-মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে অন্য অনেক বাঙালী লেখকের মত তিনি এসেছিলেন তার অন্ধি-সন্ধি হাড়-হদ্দ তাঁর জানা ছিল। মধ্যবিত্তের পোশাকী ভদ্রতার অন্তরালে যে কী বিচিত্র ধরনের নীচতা, ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার লুকিয়ে আছে একজন সূক্ষ্মদর্শী মনস্তাত্ত্বিক কথাসাহিত্যিকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তিনি তার তল পর্যন্ত তলিয়ে দেখার ক্ষমতা রাখতেন। কথাসাহিত্যিক সমাজ-প্রবাহের উপরকার স্রোতটুকু মাত্র লক্ষ্য করেন, অন্তঃসঞ্চারী স্রোতধারার অস্তিত্ব প্রায়শঃ টের পান না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তিনি বাঙালী মধ্যস্তরের সমাজ-জীবনের স্রোতের বহিঃপ্রবাহ ও অন্তঃপ্রবাহ ওই দুয়েরই সন্ধান রাখতেন এবং ওই স্রোতঃপ্রবাহের তলায় কী অপরিমাণ ক্লেদ ও আবর্জনা লুকিয়ে আছে তার তত্ত্বও বিলক্ষণ তাঁর জানা ছিল। সমাজের লোকব্যবহার ও প্রচলিত মূল্যবোধগুলির ধাঁচ-ধরন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে

মানিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর জীবন ফাঁকি ও মেকিতে ভরা, ভিতরে ফোঁপরা আর ঝরঝরে হয়ে গেলেও বাইরের ঠাট-ঠমক বজায় রাখতে তারা সদাসচেষ্ট। প্রত্যেকটি 'ভদ্রলোক' এক-একজন মুখোশধারী। পক্ষান্তরে যারা গায়ে-গতরে খেটে খায়, দৈহিক শ্রম বিনিয়োগ করে জীবিকার উপায় করে, সেই শ্রমিক ও কৃষক-সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যেই যা-কিছু সততা ও সাধুতা বিদ্যমান। সততার আসল ভিত্তি হলো মজুরি, আর এই মজুরি কলে-কারখানায় ক্ষেতে-খামারেই শুধু লভ্য।

এ-রকম চিন্তার গড়ন যাঁর তাঁর মধ্যে রোমান্টিক মনোবৃত্তি বেশীক্ষণ বাসা বেঁধে থাকতে পারে না। আবার রোমান্টিক মনোবৃত্তির সবচেয়ে কোমল ও পেলব যে অংশ—প্রেম—তাকেও এই মানুষ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। প্রেমের মধ্যে অতীন্দ্রিয় ধারণার আরোপ, জৈব কামনা-বাসনার তাড়না থেকে মুক্ত করে তাকে 'বিশুদ্ধ' একটা অনুভূতি রূপে দেখা—এ জিনিস মানিকের শিল্প-পরিকল্পনার বহির্ভূত ছিল। তিনি প্রেমের ধারণা থেকে রোমান্টিকতার অবলেপ নিঃশেষে মুছে ফেলে তাকে নিতান্ত দেহভিত্তিক এক আবেগ হিসাবে রূপ দিতে সচেষ্ট হন। এ কথার প্রমাণ স্বরূপে 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটির সবিশেষ উল্লেখ করা চলে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'অহিংসা', 'চতুষ্কোণ' প্রভৃতি বইয়ের প্রেম-চিত্রণকেও এ কথার নজীর হিসাবে খাড়া করা চলে। এ সবই তাঁর মানসিকতায় ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের প্রভাবের ফল। ফ্রয়েডের 'লিবিডো' তত্ত্ব যদিও মানিক পরবর্তীকালে অর্থাৎ যখন থেকে মানিক সজ্ঞানে সাম্যবাদী দর্শনের প্রভাব-পরিধির মধ্যে আপনাকে স্থাপন করেন, অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাহলেও সেই কুহক তিনি তাঁর লেখার ধরন-ধারণ থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেননি। একটি কম-বেশী স্থায়ী পশ্চাৎটানের মত এই প্রভাব তাঁর উত্তরকালীন চিন্তাতেও সংলগ্ন হয়ে ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অতিরিক্ত দেহসর্বস্বতা অবশ্য সঙ্গতভাবেই সমালোচ্য, তবে এর স্বপক্ষে বলবার কথা এই যে, একে রোমান্টিকতার প্রতিষেধকরূপে গণ্য করা যেতে পারে। কি ফ্রয়েডীয় স্তরে কি মার্কসীয় স্তরে, মানিক রোমান্টিক কাব্যপ্রবণতার কুজ্ঝটিকা থেকে মুক্ত ছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধতার মধ্যে মোটামুটি সম্পন্ন গৃহেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলা যায়। তাঁর পিতা ছিলেন সেটেলমেণ্টের কানুনগো। ভায়েদের মধ্যে সবার বড় যিনি তিনি সরকারের দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে আসীন ছিলেন। অন্য ভাইদের মধ্যেও কেউ কেউ কৃতী ছিলেন।

গোড়ায় একান্নবর্তী যৌথ পরিবারে বাস করতেন, পরে ওই এজমালী পরিবারের বন্ধন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেন। কিন্তু তিনি কি দারিদ্র্যবিলাসী ছিলেন? সচ্ছলতার পরিবেশ থেকে ইচ্ছা করে সরে গিয়ে গরিব হতে চেয়েছিলেন? কেউ তা চায় না, তিনিও চাননি। তবে কেন তিনি এই কাজ করতে গেলেন? করতে গেলেন এই জন্য যে, তিনি বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার কবল থেকে এই উপায়ে আপনার সত্তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। শ্রেণীজীবনের কলুষপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে শ্রেণীহীন জীবনের স্তরে লগ্ন হয়ে বাস করবার স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন। তিনি যাকে বলে 'ডিক্লাশড' হওয়া তার সাধনায় রত হয়েছিলেন। এদেশের কৃষকেরা ও শ্রমিকেরা চিরাগতভাবে দরিদ্র। বিশেষত শহরের উপকণ্ঠ-আশ্রয়ী বস্তিবাসী শ্রমিকদের দুর্দশার সীমা-পরিসীমা নেই। তিনি নিজেকে তাঁদের স্তরে নামিয়ে এনে তাঁদেরই একজন হয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন মধ্যবিত্ত জীবন আর শ্রমিক জীবনে কোথায় ফারাক এবং তৌলদণ্ডের পরিমাপে মধ্যবিত্ত অপেক্ষা নিম্নবিত্তের মনুষ্যত্বের পাল্লা ভারী না লঘু। ভারী বলেই তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, তা নয়তো তিনি সচ্ছল জীবনের স্বচ্ছন্দতার মোহ ছেড়ে আসতে পারতেন না। লক্ষ্য করবার বিষয়, পরিণত বয়সে তিনি নিজেকে সাহিত্যিক বলতেন না, বলতেন কলমপেষা মজুর। মজুর শ্রেণীর সঙ্গে শুধু শারীরিক নৈকট্য স্থাপনের জন্যই নয়, আত্মিক নৈকট্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁর আপনাকে ওই ভাবে বর্ণনা করা। কারখানার মজুর থেকে তিনি কোন মতেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতেন না। কেবল তফাতের মধ্যে ছিল তাঁর হাতিয়ারের পার্থক্য। কারখানার শ্রমিকের মূল হাতিয়ার তাঁর হাত, আর মানিকের হাতিয়ার তাঁর কলম। কলমও অবশ্য হাতেই গোঁজা থাকে, তবে কলম পিষতে হলে পেশী অপেক্ষা মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতার প্রয়োজন বেশি হয়। ওইখানেই যা ফারাক।

আমি এই বইয়ের অনত্র বলেছি, মানিকের দক্ষিণ কলকাতার যৌথ পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ থেকে স্খলিত হয়ে উত্তর কলকাতার আলমবাজার অঞ্চলের এক দরিদ্র জীর্ণ বস্তি এলাকায় বাসস্থান পরিবর্তন শুধু ওই দুই কলকাতার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যই বোঝায় না, তা একটা গূঢ়ার্থব্যঞ্জক রূপকের তাৎপর্যও বহন করে। ওই রূপক আর কিছু নয়, এক শ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীতে অবতরণের ইঙ্গিতবাহী। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিম্নবিত্ত সমাজের সামিল হওয়া রূপ পরিবর্তনের দ্যোতক। কিন্তু এই পরিবর্তনকে অবতরণই বা বলি কেন? উত্তরণ কেন বলব না? কেন একে

নিম্নাভিমুখী গতি বলব? এটি উর্ধ্বাভিমুখী গতি নয় কেন? কে কী ভাবে সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনকে বিচার করে তার উপরেই নির্ভর করে ওই পরিবর্তনের স্বরূপের বর্ণনা। উত্তরণ অবতরণ উর্ধ্ব-অধঃ উচ্চ-নীচ এ সবই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন। দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হলে নিম্ন উচ্চে রূপান্তরিত হতে কতক্ষণ?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় আদর্শবাদী লেখক ছিলেন। আদর্শের সঙ্গে রফা করে চলার নীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না—সর্বদাই আদর্শের জন্য মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে নানা কারণে তিনি ঘোরতর দারিদ্র্যের প্রকোপে পড়েছিলেন। আদর্শের সঙ্গে আপস করে চলার পথ ধরলে তিনি সহজেই তাঁর এই দারিদ্র্যদশা ঘুচাতে পারতেন কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শ থেকে একচুলও হেলেননি বা বেঁকেননি। তিনি বরং সপরিবারে উপোস করে থাকবেন তবু বাজারী পত্রিকাগুলিতে লেখা দিয়ে নিজেকে ছোট করতে রাজী ছিলেন না। ওইসব সূত্র থেকে মোটা রকমের অর্থপ্রাপ্তির লোভ সংবরণ করে তিনি তাঁর একাধিক শারদীয় সংখ্যার গল্প সামান্য অর্থের বিনিময়ে অথবা সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে দিয়েছেন। এই থেকেই মানুষটির ধাত বোঝা যায়।

এ শুধু গতানুগতিক ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত নয়। এর মধ্যে মহৎ চরিত্রবত্তার প্রমাণও প্রতিফলিত। আমাদের দেশের কয়জন প্রতিষ্ঠাপন্ন নামী লেখক আদর্শের খাতিরে এ রকম চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাতে পেরেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

মানিক সাহিত্যের শিল্পমূল্য

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর শিল্পমূল্য নিরূপণ করতে হলে তার বাস্তববাদের মধ্যেই তার মূল অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা বাস্তববাদেই মানিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য নিহিত আর এই বাস্তববাদই মানিকের রচিত গল্প-উপন্যাসকে আর অন্য সব কথাকারদের গল্প-উপন্যাস থেকে আলাদা করে দিয়েছে—কি চারিত্রধর্মে কি দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে। বাস্তববাদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার শ্রেষ্ঠ পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নও বটে আভরণও বটে।

অবশ্য বাস্তববাদ বাংলা কথাসাহিত্যে আগেও ছিল, মানিক এই পথের পথিকৃৎ নিশ্চয়ই নন। তবে তাঁর হাতেই বাস্তববাদের সবচেয়ে পরিস্ফুরণ ও সম্প্রসার ঘটেছিল; শুধু তাই নয়, তাঁর হাতে পড়ে বাস্তববাদের গোত্রবদলও ঘটেছিল। যা ছিল আগে নেহাৎই পর্যবেক্ষণমূলক বাস্তববাদ, তা মানিকের ক্ষুরধার লেখনীর শানে নিশিত হয়ে পরিণত হয় উদ্দেশ্যমূলক বাস্তববাদে—সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে মানিক তাঁর বাস্তববাদকে ব্যবহার করেন। মানিকের প্রচারিত বাস্তববাদে অর্থনৈতিক বৈষম আর শোষণবঞ্চনাপীড়িত বাঙালি সমাজের ক্ষয়ের দিকটি প্রদর্শিত হয়। বিশেষ, মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়ের পচা-গলা রূপটি এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আর কোন শিল্পী জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেননি। কিন্তু এ সবই তিনি করেছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সে উদ্দেশ্য হল, এই ঘুণে ধরা জরাজীর্ণ সমাজ কাঠামোটাকে ভেঙে ফেলে তার জায়গায় সমসমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান সাহিত্যের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। অর্থাৎ, মানিকের লক্ষ্য নিছক সাহিত্য সৃষ্টি নয়, সাহিত্য সৃষ্টিকে নতুন সমাজসৃষ্টির কাজে লাগানো।

এইখানেই পূর্ববর্তী বাস্তববাদী কথাকারদের থেকে মানিক সাহিত্যের বাস্তবতার তফাত। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র একজন বাস্তবঘনিষ্ঠ লেখক ছিলেন, সকলেই জানেন। বস্তুত তাঁর গল্পোপন্যাসের গোটা ইমারতটি দাঁড়িয়ে আছে বাস্তবতার ভিত্তির উপর। দেখা বস্তু কিংবা দেখা মানুষকেই তিনি তাঁর ছোটগল্প আর উপন্যাসের চিত্র-চরিত্ররূপে দাঁড় করাতে ভালবাসতেন প্রধানত—ঘটনার বর্ণনায় অথবা চরিত্রের রূপায়ণে কাল্পনিকতাকে তিনি খুব বেশী প্রশ্রয় দিতেন না। শরৎ সাহিত্যের জীবন্ততার মূলে রয়েছে তাঁর এই বাস্তবের প্রতি গভীর বিশ্বস্ততার মনোভাব।

কিন্তু ওই বিশ্বস্ততার সীমাবদ্ধতাও ছিল। তিনি একান্তভাবে পর্যবেক্ষণ বা অবজার্ভেশনকেই আশ্রয় করেছিলেন তাঁর কথাশিল্পের উপকরণ-উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে। পর্যবেক্ষণকে ছাপিয়ে তাঁর শিল্পদৃষ্টি ভবিষ্যতে প্রসারিত হয়েছে খুব কম ক্ষেত্রেই। শরৎচন্দ্র সমস্যা উত্থাপন করতেন কিন্তু সমাধানের কোন ইঙ্গিত দিতেন না। তিনি মনে করতেন সমাধানের পথের হদিস দেওয়াটা কথাশিল্পীর কাজ নয়, সমস্যাকে তুলে ধরতে পারাতেই শিল্পের সার্থকতা। সমস্যার উত্থাপনের সাহায্যে সমাজ মনকে জাগ্রত করার বেশী শরৎচন্দ্র আর কিছু চাইতেন না—তাঁর ভূমিকা ওইখানেই শেষ ভেবে তিনি তৃপ্তি মানতেন।

কিন্তু মানিকের সাহিত্য তেমন নয়। তিনি তাঁর গল্পে উপন্যাসে সমস্যার অবতারণা করতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের পথও বাতলে দিতেন। এই রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝরঝরে হয়ে আসা সমাজ কাঠামোটাকে টিকিয়ে রাখা নিরর্থক একথা যেমন তিনি বলতেন তেমনি কোন্ পথে কী উপায়ে এর অবসান ঘটিয়ে সুস্থ সমাজের প্রতিষ্ঠা করা যায় তার নিশানাও বাতলে দিতে ভুলতেন না। এই নিশানা দাগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মানিকের অন্তরে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্যের প্রণোদনা ছিল। সেই লক্ষ্য আর কিছু নয়, ভারতভূমিতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠা, আমাদের জীবনের আচরণে ও কর্মে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণাকে জয়যুক্ত করে তোলা। এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানিকের চিন্তায় কোন অস্বচ্ছতা ছিল না, ফলে সমস্যার চিত্রণের মত সমস্যার সমাধান নির্দেশেও তাঁকে কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখা যায়নি। তাঁর সমাধানগুলি ছিল অকম্পিত, প্রত্যয়সিদ্ধ, অমোঘ।

শরৎচন্দ্রের রেখাচিহ্ন অনুসরণ করে আরও কতিপয় কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে আমাদের সাহিত্যে বাস্তববাদের অনুশীলন করে গেছেন —জগদীশ গুপ্ত, নরেশ সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ। জগদীশ গুপ্ত ছিলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বাস্তববাদী কথাকার। রোমান্টিকতার কুয়াশা বর্জিত তাঁর লেখা, চাঁছাছোলা তাঁর শিল্পের বক্তব্য। কিন্তু তাঁর বাস্তববাদের কোন লক্ষ্য ছিল না। সমাজের বর্তমান বিকৃত বীভৎস কুৎসিত রূপটিকে কেন তিনি কথাসাহিত্যের আধারে বাঙালি পাঠকের কাছে তুলে ধরছেন সে বিষয়ে তাঁর নিজের মনেই বোধহয় স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। কেন তিনি অ-রোমান্টিক তারও কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না তাঁর লেখা থেকে। তার উপরে অতিরিক্ত যৌনতা,

অকারণ যৌনতা তাঁর রচনাকে কটুস্বাদ করে দিয়েছে প্রায়শ। বাস্তবতার সঠিক আন্দাজ দেবার জন্য যৌনতাকে নিয়ে কচলানোর কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমরা জানি যৌনতার অনুষঙ্গ বাদ দিয়েই আমাদের প্রচলিত সমাজের রূপ কত নিষ্ঠুর, কত কদাকার। বাস্তবতার অজুহাতে যৌনতাকে কেন্দ্র করে দেহ-চিত্রণের আতিশয্য বর্ণন লেখকেরই যৌন-মনস্কতার প্রক্ষেপণ মাত্র, বাস্তবতার সেটা মৌল লক্ষণ নয়।

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের লেখাতেও দেহ-চিত্রণ আছে। যেমন 'দিবারাত্রির কাব্য', 'অহিংসা', 'দর্পণ', 'চতুষ্কোণ' প্রভৃতি উপন্যাসের উল্লেখ করা যায় এ কথার নজির স্বরূপে। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত কিংবা তদনুরূপ অন্যান্য লেখকদের থেকে মানিকের দেহ-চিত্রণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থনৈতিক অসাম্য ও বৈষম্যপীড়িত বর্তমান সমাজে নরনারীর সম্পর্ক কী সাংঘাতিক অস্বাভাবিকতার ব্যাধিতে ভুগছে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক প্রায়শ কত কৃত্রিম ও ক্লিন্ন এইটি দেখানোই মানিকের অভিপ্রায়। আর এই অভিপ্রায়ের ভিতর লুকোছাপা কিছু নেই। —বর্তমান সমাজকে গুঁড়িয়ে ফেলে তার অস্থিচূর্ণের উপর নতুন সমাজের ভিত্ প্রতিষ্ঠাই ছিল সাম্যবাদী মানিকের কামনা। দেহবাদের জন্যই দেহবাদকে চিত্রিত করা মানিকের উদ্দেশ্য ছিল না।

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত আমাদের কথাসাহিত্যে বাস্তবতার অন্যতম পথপ্রদর্শক। তবে তাঁর বাস্তবতার চিত্রণ বড়ই স্থূল, মোটা দাগের রেখায় চিহ্নিত। তাঁর 'পাপের ছাপ', 'শুভা', 'পিতাপুত্র', 'বিপর্যয়' প্রভৃতি উপন্যাসে শিল্পরসের জ্যোৎস্না বড় কম। কাটখোট্টা তাঁর লেখার ধরন। এই কারণেই সম্ভবত যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আর প্রত্যয়ের দৃঢ়তা থাকা সত্ত্বেও নরেশচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যে বাস্তবতার ঘরানায় তাঁর কোন ধারা সৃষ্টি করে যেতে পারেননি, তাঁর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের প্রভাবও খর্ব হয়ে এসেছে। তবে তাঁর শতবার্ষিকীর বৎসরে তাঁর সম্পর্কে আবার বেশ কিছুটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।

শৈলজানন্দ একান্তভাবেই শরৎচন্দ্রের পথানুসারী কথাসাহিত্যিক। পর্যবেক্ষণের সুফলের উপর ভর করে তিনি তাঁর বাস্তববাদের প্রাকার দাঁড় করিয়েছিলেন। হৃদয়টি ছিল তাঁর শরৎচন্দ্রের মতই অপরিমিত মানবপ্রেমে ভরপুর। তবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শৈলজানন্দের বাস্তববাদের এখানে পার্থক্য যে, বিষয়বস্তুর রূপায়ণে শৈলজানন্দ বাংলার পরিচিত গ্রাম-ঘরকে অঙ্কিত করবার বদলে বাংলা-বিহারের সীমান্তে অবস্থিত কয়লা খনি অঞ্চলের কুলিকামিন

নরনারীদের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনাকেই সমধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন বাস্তববাদের উপকরণ-উপাদান রূপে। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিটি মনোরম। তবে রচনার পিছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্যের পোষকতা নেই, নেহাৎ গল্প বলার আকুতি থেকেই গল্প-শিল্পের চর্চা। মহৎ উদ্দেশ্যের পোষকতা বলতে আদর্শবাদের প্রণোদনা বোঝাচ্ছে। এই আদর্শবাদ শৈলজানন্দ-সাহিত্যে অনুপস্থিত। যেখানে সাধারণ আদর্শবাদেরই দেখা নেই, সেখানে মানিকের ধরনে সাম্যবাদী আদর্শবাদ তো আরও বহু দূরস্থান, সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'পাঁক', 'পঞ্চশর', 'বেনামী বন্দর' প্রভৃতি গল্পোপন্যাস-গ্রন্থগুলিতে এক ধরনের বাস্তববাদের চর্চা করেছেন এবং সে বাস্তববাদের ভিতর কল্লোল যুগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রত্যাশিতভাবেই নিচু তলার জীবনের ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে দেখতে পাই। শৈলজানন্দের মত প্রেমেন্দ্রও দরদী কথাকার। তবে শৈলজানন্দের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানে যে, প্রেমেন্দ্র বাস্তববাদী হয়েও রোমাণ্টিক স্বপ্নিলতার কুহক থেকে মুক্ত নন। জীবন সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে একটা রহস্যের বোধ আছে, সেই রহস্যময়তাই প্রেমেন্দ্রের শিল্পদৃষ্টিতে রোমাণ্টিকতার সঞ্চার করেছে বলে সন্দেহ হয়। খুব সম্ভব মূলত কবি বলেই প্রেমেন্দ্রের মানস গঠনের এই ধাঁচ। আর এইটেই বোধকরি অন্যতম কারণ যার জন্য দেখা যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র পরবর্তীকালে তাঁর প্রথম বয়সের বাস্তববাদ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। এখন আর নিচুতলার জীবন তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে না পূর্বের মত—'এস্টাব্লিশমেণ্ট' অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থচালিত সংস্থাগুলির অনুগত লেখকদের অনুকরণে তিনিও তাঁর প্রথম বয়সের 'কমিটমেণ্ট' ভুলে গিয়ে মধ্যবিত্তের চিরাভ্যস্ত 'ভদ্রলোগী' সংস্কারগুলির উপর দাগা বুলিয়ে চলেছেন অন্ধভাবে পরম নিষ্ঠায়। তিনি এখন আমাদের বনেদী পাঠকসমাজ কর্তৃক 'গৃহীত' একজন 'সম্ভ্রান্ত' লেখক—তাঁর পুরোনো বিদ্রোহের ছিটেফোঁটাও আজ আর বেঁচে নেই।

অথচ আমরা জানি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর এই মধ্যবিত্ত জীবন-রীতিসুলভ ভদ্রলোকী সংস্কারগুলির উপর চাবুক হেনে গেছেন নির্মমভাবে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেকী ভদ্রতার তিনি ছিলেন দুশমন স্বরূপ। ভদ্রলোকদের 'ভদ্রলোগামি'র অন্তরালে যে-পর্বতপ্রমাণ ভণ্ডামি আর মিথ্যাচার লুকিয়ে আছে তার মুখোশটি তিনি খসিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর একাধিক ছোটগল্পে ও উপন্যাসে। 'সমুদ্রের স্বাদ' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'লেখকের কথা' শিরোনামে লেখেন—"ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল

মধ্যবিত্তদের নিয়ে 'সমুদ্রের স্বাদের' গল্পগুলি লেখা। প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি ছুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মরমর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙ্গে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। তখন জানা ছিল না যে ওগুলি জীবন যুদ্ধের ক্ষত নয়, জরার চিহ্ন, ভাঙনের ইঙ্গিত ; জানা ছিল না যে স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল—সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।"

এই একই ভূমিকায় মানিক একটু পরে লিখছেন—"মধ্যবিত্ত ভদ্রদের পরিণাম জানতাম না বটে ; তবে পচা ভদ্রতার মিথ্যা খোলস খুলে সবাই ছোটলোক হোক এ পরিণাম যে কামনা করতাম আমার অনেক গল্পেই তা ঘোষণা করার চেষ্টা করেছি।"

এর থেকেই মধ্যবিত্ত সমাজের পরিণাম সম্বন্ধে মানিকের নির্মোহ দৃষ্টির পরিচয় মেলে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার চূড়ান্ত অসারতাও তাঁর চোখে স্পষ্ট। অথচ আমাদের বেশ কিছু সংখ্যক লেখক আজও মোহভরে মধ্যবিত্ত মূল্য-বোধগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে সচেষ্ট। প্রথম বয়সে বিদ্রোহ-প্রতিবাদ ইত্যাদি নিয়ম-ভাঙার পথে সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত করে 'তোবা তোবা' করে রণে ভঙ্গ দিয়ে 'ভালো মানুষ' লেখক বনে যাবার দৃষ্টান্ত শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্রই নন, আরও অনেকে আছেন। অচিন্ত্যকুমারও এই দলে পড়েন।

অচিন্ত্যকুমার প্রথম দিকে 'বেদে' এবং মধ্য বয়সে 'যতন বিবি', 'কাঠ-খড়-কেরাসিন' প্রভৃতি উপন্যাস-গল্পের বই লিখে বাস্তবতার দ্বন্দ্ব করে ছেড়েছিলেন। শেষোক্ত গল্প সংগ্রহের এই ছুটিতে বাস্তবতার ঠাটের বদলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে-সংঘাতে জর্জরিত বাংলার গাঁয়ের নিরন্ন বুভুক্ষু কৃষক নর-নারীর দৈন্য-দশার অতি মর্মস্পর্শী চিত্র আছে। যুদ্ধের বাজারের নিত্য অভাবের পীড়নে দিশেহারা ভাগ্যহত চাষী সমাজের যে ছবি তিনি এখানে এঁকেছেন তা চিত্তকে দ্রবীভূত করে। অথচ সেই অচিন্ত্যকুমারই কিনা পরে বাস্তববাদকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভক্তিবাদে আত্মসমর্পণ করেছেন দেখা যায়। মঠ-মিশনের সঙ্গে কাঁধ

ঘেঁষাঘেঁষি করবার আকুলতায় তিনি বাস্তববাদকে শিকেয় তুলে রাখতেও পশ্চাৎপদ হননি। সে-বাস্তববাদ আর মাটিতে কখনও নামেনি। ভক্তির ঠাণ্ডা হিম স্পর্শে বাস্তববাদ কর্পূর হয়ে উবে যেতে আমরা দেখলুম।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এঁদের পরিপোষিত বাস্তববাদ থেকে মানিকের বাস্তববাদের ধরন একেবারেই আলাদা। এঁদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর লেখক ছিলেন মানিক। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাকে সাহিত্যেও সমপরিমাণে আচরণ করতে চেষ্টিত থাকতেন। তাঁর প্রত্যয় আর তাঁর সাহিত্য এক বিন্দুতে এসে মিলে গিয়েছিল। অপরাপর একাধিক লেখকের মত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে বিচরণ করেননি—জায়গা নাড়িয়ে এক ঠাঁই থেকে অন্য ঠাঁই যাওয়া তাঁর স্বভাব ছিল না। ধ্রুব নক্ষত্রের মত একটি বিশ্বাসেই তিনি নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন, সেই বিশ্বাসকেই তাঁর সাহিত্যের সঞ্চালক করে পথ চলেছেন। আর এই বিশ্বাসেই তাঁর জীবনপাত হয়েছিল।

মানিক সাহিত্যে যে-বাস্তববাদ প্রতিফলিত হয়েছিল, স্বরূপ লক্ষণ অনুযায়ী তার নামকরণ করতে গেলে তাকে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' নামে অভিহিত করতে হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিভাষায় যাকে 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম' বলা হয়, এটি তার সঙ্গে অভিন্ন বা তারই স্বগোত্র। এই বাস্তববাদ নিছকই পর্যবেক্ষণনির্ভর বাস্তববাদ নয়, পরন্তু উদ্দেশ্যভিত্তিক বাস্তববাদ। সমাজ-চেতনা এর কুললক্ষণ, সমাজ-পরিবর্তন এর লক্ষ্য। সমাজ-পরিবর্তনও আবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে সমাজ-পরিবর্তন—সাহিত্যের আধারে সমাজতন্ত্রের আবাহন, সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা। রুশ সাহিত্যে গর্কি এই জাতীয় সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম-এর চর্চা করেছেন, আমাদের সাহিত্যে তারই উত্তরসাধক হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক-সাহিত্যের শিল্পমূল্য এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের বিচার করতে হবে।

মানিকের সাহিত্যে বাস্তবতা এবং শিল্পোৎকর্ষ দুইয়েরই এককালীন সমাহার ঘটেছিল। শুধু বাস্তবতা নয়, শুধুই শিল্পরস নয়, দুইয়ের যোগফল মানিক-সাহিত্যের রূপ ধরেছিল। অবশ্য প্রথম দিক্‌কার রচনায় মানিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব সঞ্জাত মনোবিকলনের কিছু আতিশয্য ঘটেছিল। মানুষের অসুস্থ বাসনা-কামনাকে চিরে-ফেঁড়ে ব্যবচ্ছেদ করে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার একটা প্রবণতা একটা আবেশের (অবসেসন) মত তাঁকে পেয়ে বসেছিল। মানুষের আচরণের 'কী' ও 'কেন' তাঁকে উদ্ব্যস্ত করে রাখত

এবং যতক্ষণ না তার সন্তোষজনক সমাধান তিনি নিজের মধ্যে খুঁজে পেতেন ততক্ষণ তাঁর চিত্ত শান্তি মানত না। এই অস্থিরতা এসেছিল তাঁর মধ্যে দুর্মর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল থেকে, প্রতিটি মানবীয় আচরণের তল পর্যন্ত খুঁজে দেখবার বাই—হাঁ, একে 'বাই'-ই বলতে হয়—তাঁর মনকে সর্বদা অশান্ত করে রাখত। ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্জ্ঞান মনের সূক্ষ্ম ছলাকলা-বিভ্রমের স্বরূপ নির্ণয়ে তাঁকে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে দেখি প্রথম দিকের গল্পোপন্যাসে। তখনও তাঁর মধ্যে সামাজিক দৃষ্টির তেমন করে উদ্ভাস ঘটেনি। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণপ্রবণতা যে মানিক-সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল গোড়ার দিকে. সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

এ কথার প্রমাণ স্বরূপে প্রথম দিকের উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কিংবা 'মিহি ও মোটা কাহিনী'র মনস্তত্ত্বপ্রধান গল্পগুলির উল্লেখ করতে হয়। 'বৌ'-পর্যায়ের গল্পগুলিকেও এই পর্যায়ের রচনার অন্তর্ভুক্ত করা চলে। অতিশয় অন্তর্নিবেশমূলক এ সকল রচনার প্রকৃতি—ব্যক্তিসাক্ষিক (সাবজেকটিভ), আত্মকেন্দ্রিক। বৃহত্তর সমাজ এ সকল রচনায় কম-বেশী অনুপস্থিত। ফ্রয়েড মানুষের কামনা-বাসনার উৎস সন্ধানে পরিপার্শ্বের ভূমিকা তেমন মানতেন না, বংশগতি (হেরিডিটি) ও বাল্যার্জিত সংস্কারকেই সমধিক প্রাধান্য দিতেন। এখানেও অনেকটা সেই রকমের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করা হয়েছে।

যেমন, 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে রোমান্টিক প্রেমের অসারতা দেখানোই উদ্দেশ্য। প্রেম নামক সমাজ প্রচলিত অভ্যাসটিকে ঘিরে যে মধুর স্বপ্নমোহ জড়ানো থাকে তার পর্দা ছিন্নভিন্ন করে দেখানোর জন্যই মানিক এই উপন্যাসে হেরম্ব নামক এক জটিল মনের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। হেরম্ব, মালতী আর কিশোরী মেয়ে আনন্দ এই দুয়েতেই একই কালে আসক্ত, ইদানীং আনন্দের প্রতিই তার মনোযোগ কিঞ্চিৎ বেশী। মালতী পরস্ত্রী জেনেও তার প্রতি তার আকর্ষণের কমতি হয় না। এ এক অসুস্থ, অস্বাভাবিক, বিকৃত প্রেমের বিগ্রহমূলে ভোগারতির চিত্রণ। মানিক নির্মোহ দৃষ্টির নির্বেদ সহকারে এমন যে জটিল-কুটিল দেহবাসনার অন্ধকার, তার গহনে তাঁর শিল্পদৃষ্টিকে সঞ্চালিত করেছেন। এমনতর অন্ধকারের উপর বৈজ্ঞানিক সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে তাঁর হাত একটুও কাঁপেনি। ভালবাসা নামক বস্তুটি যে সবটাই জৈব প্রবৃত্তির একটা খেলা, তার ভিতর রোমান্সের বাষ্পও নেই, এইটে প্রতিপাদন করাই 'দিবারাত্রির কাব্য' নামক উপন্যাসটির উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

শিল্পকর্ম হিসাবে খুবই শক্তিশালী রচনা, কিন্তু সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে অল্পবিস্তর অসার্থক। ব্যক্তিমনের অসুস্থ কামনা-বাসনাই এই উপন্যাসের কেন্দ্র অধিকার করে রয়েছে, বৃহত্তর সমাজ এখানে অনুপস্থিত। এই রচনায় ব্যক্তিমনের অন্তর্লীন কুটিল-ক্লিন্ন চিন্তার আঁকিবুঁকি অতি স্পষ্ট, সুস্থ মননের আলো অন্ধকার গহনের উপর তেমন পড়েছে কিনা সন্দেহ।

অন্যপক্ষে, 'পুতুলনাচের ইতিকথা' খুবই অসামান্য উপন্যাস শিল্পের মানদণ্ডে কিন্তু অকারণ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা-কুটিলতায় কিয়ৎ পরিমাণে খণ্ডিত ও ব্যক্তিবাদের দ্বারা কলুষিত। তাছাড়া বইটিতে যে-বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে—নিয়তিবাদ (মানুষ দৈবের হাতে ক্রীড়নক মাত্র, তার স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য সামান্য : শশীর গাঁওদিয়া গ্রাম ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা আকাশ-কুসুম স্বপ্ন মাত্র, ভবিতব্যের বিধানেই এঁদো গাঁয়ের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই ইত্যাকার সব ভাবনা)—স্পষ্টতই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির আদর্শ এবং সেই আদর্শের জোরে সকলে মিলে একসঙ্গে অপ্রতিহত বেগে পথ চলার নীতির পরিপন্থী। সনাতন ভারতীয় অদৃষ্টবাদ এখানে লেখকের অজ্ঞাতসারেই খুব সম্ভবত বইটির উপর অনভিপ্রেত ছাপ ফেলেছে এবং তার শিল্পমূল্য কমবেশী কাঁচিয়ে দিয়েছে।

'মিহি ও মোটা কাহিনী'র গল্পগুলির অতিরিক্ত মনস্তত্ত্বপরায়ণতা ও বিকৃত কৌতূহল ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান তত্ত্বের অস্বাভাবিকতারই শুধু প্রমাণ করে, আর কিছু করে না। টিকটিকি, ছায়া, বিপত্নীক প্রভৃতি ছোটগল্প অসুস্থ মনস্তত্ত্ব-বিলাসের এক একটি মোক্ষম নমুনা। কিংবা 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পসংগ্রহের মানুষ হাসে কেন গল্পটি মর্বিড চিন্তার সঙ্গে ব্যাধির সাদৃশ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। 'বৌ' পর্যায়ের গল্পগুলিও তথৈবচ।

কিন্তু মানিকের এই মনস্তাত্ত্বিক আবেশ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। যখন থেকে তাঁর চেতনায় সমষ্টিচেতনার উত্তরোত্তর উন্মেষ ঘটতে লাগল, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দীক্ষায় জনকল্যাণের আদর্শ তাঁর মনে দৃঢ়মূলভাবে প্রোথিত হতে থাকল তখন থেকেই তাঁর সাহিত্য থেকে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের ব্যক্তিবাদী স্বেচ্ছাচারী চিন্তার প্রভাব ঝরে যেতে আরম্ভ করল। ফ্রয়েডের স্থান দখল করলেন মার্কস, ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্ম-আবেশী চিন্তার বদলে তার জায়গায় দেখা দিল সমগ্র মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের ধারণা। ব্যক্তির মনোবিকারের অন্তহীন ব্যবচ্ছেদী বিশ্লেষণে আর তিনি সুখ পেলেন না, এখন থেকে তাঁর দৃষ্টি ক্রমশ হয়ে উঠল বহির্মুখ। অন্তরের থেকে তাঁর মনোযোগ আসার মধ্যে এল ইহ

ছেড়ে বাঁচতে চাইল। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থভাবনা নয়, সমষ্টিগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যেই যে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত—এই বোধে তিনি উত্তরোত্তর দীপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর সাহিত্যেরও গোত্রবদল হল।

এই গোত্রবদলের প্রক্রিয়ার আরম্ভ 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস দিয়ে এবং শেষ হয়েছে একেবারে অন্তিম পর্যায়ে এসে। প্রায় দুই দশকের অবিচ্ছেদ এই প্রক্রিয়া। মধ্যবর্তী স্তরে এই বিরতিচ্ছেদহীন পর্বের কয়েকটি লক্ষণীয় দিক্‌চিহ্ন হল—'সহরতলী' উপন্যাস দুই খণ্ড, 'দর্পণ', 'জীয়ন্ত', 'চিহ্ন' 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'সোনার চেয়ে দামী' দুই খণ্ড, 'সার্বজনীন', 'হরফ' প্রভৃতি উপন্যাস এবং উত্তরকালের একাধিক ছোটগল্প যার মধ্যে পড়ে ফেরিওয়ালা, দুঃশাসনীয়, কংক্রীট, শিল্পী, মাসি পিসি, বাগদীপাড়া দিয়ে, পেটব্যথা হারানের নাতজামাই, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, ওরা ছিনিয়ে খায় না কেন, টিচার প্রভৃতি অবিস্মরণীয় সব রচনা। প্রথম বয়সের প্রাগৈতিহাসিক, টিকটিকি, সরীসৃপ, কুষ্ঠরোগীর বউ প্রভৃতি গল্প থেকে এ সকল গল্পের প্রভৃতি, দৃষ্টিকোণ ও বক্তব্য এতই আলাদা যে প্রথম দর্শনে একই লেখকের লেখা কিনা এমন বিভ্রম জাগে। উত্তরকালের গল্পগুলির বর্ণন ঋজু, সরলরেখ, বলিষ্ঠ। প্রথম বয়সের গল্পের মত যৌনতা কিংবা মনোবিকারের রেখাঙ্কনে বক্রকুটিল নয়। সমাজকল্যাণাদর্শের বহির্মুখী রৌদ্রালোকের ছটায় এখানে সবই স্বচ্ছ, স্পষ্ট, পরিষ্কার; অন্ধকার ছায়ার কুটিলতায় মলিন কিংবা বাঁকাচোরা নয়। শিল্পের দৃষ্টি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সমাজদর্শনে উত্তরিত হলে তার এমনতর রূপান্তরই বুঝি হয়।

মানিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তবেই তার যথার্থ শিল্পমূল্য আমরা উপলব্ধি করতে পারব।

উত্তরণ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে একটি অনন্য নাম। তাঁর চিন্তা আলাদা, দৃষ্টিকোণ আলাদা, জীবন ও সমাজকে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিও আলাদা। বাংলা সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতার তিনি পথিকৃৎ তো বটেই, অদ্যাবধি এই ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বীও বটেন। এখনও পর্যন্ত বাস্তবতার রূপায়ণে কি তীক্ষ্ণতায় কি গভীরতায় আর কোন লেখক তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি।

অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা গল্পে ও উপন্যাসে এক ধরনের বাস্তবতার প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের রচনায় প্রভূত শক্তিমত্তার পরিচয় থাকলেও উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা ছিল না। কেন তাঁরা কথাসাহিত্যের আধারে বাংলার সমাজের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন সে বিষয়ে তাঁদের চিন্তা স্বচ্ছ ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁদের লেখায় মানবতার আবেগ যথেষ্টই ছিল কিন্তু মানবতার আবেগকে সমাজ-পরিবর্তনের প্রকরণ হিসাবে ব্যবহার করবার কথা তাঁদের কখনও মনে হয়নি। আর মনে যদি বা হয়েও থাকে, তাতে ইচ্ছার বা আন্তরিকতার জোর ছিল না।

এঁদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখানেই পার্থক্য। মানিক তাঁর কথাসাহিত্যকে সচেতনভাবে সমাজ পরিবর্তনের কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি জেনে-বুঝে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর প্রকাশ-মাধ্যম, অর্থাৎ ছোটগল্প ও উপন্যাসের শিল্পকে ব্যবহার করেছিলেন। অন্ততঃ চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আরম্ভ করে তাঁর মৃত্যুর দিন (১৯৫৬) পর্যন্ত সময়-সীমার মধ্যে তিনি যা-কিছু লিখেছিলেন তাতে যে এই উদ্দেশ্য বিশেষ সক্রিয় ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। উদ্দেশ্যটি আর কিছু নয়, এই পচনশীল ঘুণে-ধরা মুমূর্ষু সমাজ ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে ফেলে তার সমাধি-ভূমির উপর সমসমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা—এমন সমাজ, যেখানে অন্যায় থাকবে না, অত্যাচার থাকবে না, ধনী ও নির্ধনের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে শ্রেণীহীন সমাজের উদ্ভব হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই মানিক তাঁর শেষ পর্যায়ের যাবতীয় লেখা লিখেছিলেন। তাঁর লেখনী চালনার আর ভিন্নতর কোন লক্ষ্য ছিল না।

পূর্বোল্লিখিত লেখকদের সামনে এমন কোন উদ্দেশ্যের পোষকতা ছিল তার প্রমাণ নেই। তাঁদের মানবতার আবেগ মানবতার আবেগে এসেই ঠেকে

গিয়েছিল, মানবতাকে ছাপিয়ে ও ছাড়িয়ে তা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সমুত্তীর্ণ হতে পারেনি। জগদীশ-শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র প্রমুখের বাস্তবতা অনির্দেশ্য ও অসংজ্ঞেয় বাস্তবতা, মানিকের বাস্তবতার মত তাকে লক্ষ্যবেধী বাস্তবতা বলা চলে না।

শুধু তাই নয়, এঁদের সঙ্গে মানিকের আরও তফাৎ এখানে যে, মানিক শুধু সাহিত্যের অঙ্গনেই সমাজ-পরিবর্তনের জন্য কাজ করেননি, জীবনের এলাকাতেও সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যকে জয়যুক্ত করবার জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন শিল্পী ও কর্মী। শিল্পচর্চার সঙ্গে কর্মিষ্ঠতার এমন সংযোগ লেখকদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, যেমনটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে ঘটেছিল। তিনি চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে, ঠিক ঠিক সময়ের হিসাবে ১৯৪৪ সাল থেকে, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদভুক্ত হন এবং একজন নিষ্ঠাবান্ রাজনৈতিক দলীয় কর্মীর মত দলের সমস্ত শৃঙ্খলা-বিধি, কর্তব্যকর্মের নির্দেশ পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করেন। সেইসঙ্গে চলতে থাকে তাঁর অবিশ্রান্ত সাহিত্যের অনুশীলন। ভগ্নস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য বারে বারে তাঁর সাধনা বিপর্যস্ত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত ও সেই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে সংকল্পবদ্ধ, সেই কারণে শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তাঁর সংগ্রামশীলতা তথা শিল্পনিষ্ঠা অজেয় থেকেছে। কোন কিছুতেই তাঁকে অবদমিত করতে পারেনি। শুধু শিল্পী হলে এরকম কঠিন যুদ্ধ একনাগাড়ে তিনি চালিয়ে যেতে পারতেন কিনা সন্দেহ, তাঁর দলীয় শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্যপরায়ণতা ও কর্মীর ভূমিকাই তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

লোকে বলে, রাজনীতির বন্ধন শিল্পীর পক্ষে মারাত্মক ; তাঁকে প্রায়শঃ শিল্পীর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করে প্রচারবাদীতে রূপান্তরিত করে। একথা যে কত ভুল, তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলায় চোখে পড়ে। বরং দেখা যায়, রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী-সত্তার প্রকৃত স্ফুরণ হয়েছিল। তাঁর প্রথম দিককার রচনায় ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের রীতির প্রতি অনুরক্তিবশতঃ যে অত্যধিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়, তা উত্তরকালের লেখায় বহুল পরিমাণে মন্দীভূত হয়েছিল এবং তার ফলে লেখার ধারা অনেক বেশী সহজ, সরল ও বহির্মুখ হয়ে উঠেছিল। মানুষের নির্জ্ঞান ও অর্ধজ্ঞান মনের অন্ধকারে যে-সকল কুটিল ও অসুস্থ চিন্তা ঘুরপাক খেয়ে মরে এবং মানুষের প্রবৃত্তিকে নিম্নগামী করবার চেষ্টা করে, তার উপর মনোবিকলনের তীব্র সন্ধানী আলো ফেলে তাকে চিরে-ফেঁড়ে ব্যবচ্ছেদ করবার একটা ঝোঁক প্রথম বয়সের রচনায় পর্বে মানিককে

এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, তা একটা দুরারোগ্য আবেশের মত হয়ে দাঁড়ায়। এ আবেশ অন্তর্নিবেশমূলক, কাজেই আত্মকেন্দ্রিক। সমষ্টি মানুষের ভাবনায় মানিকের চেতনা উদ্ভাসিত হওয়া না পর্যন্ত মানিক এই আত্মকেন্দ্রিকতার অভ্যাস থেকে মুক্তি পাননি—তাঁর রচনায় বহির্জীবনের রৌদ্রালোক ছড়িয়ে পড়েনি।

মানিকের লেখক-জীবনে এই বহিশ্চেতনার স্ফুরণ হয় তাঁর মার্কসবাদী আদর্শে দীক্ষা গ্রহণের পরে। তখন থেকে তাঁর লেখনীর আর ব্যক্তিভিত্তিক মনোবিকলনের প্রক্রিয়ায় আগের উৎসাহ দেখতে পাইনে, বরং দেখি যে, তিনি সমষ্টিভূত সাধারণ মানুষের সংগ্রামশীল জীবনকে গল্পে ও উপন্যাসে চিত্রিত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ব্যক্তি মনের অন্ধকার গলি-ঘুঁজিতে পথ-পরিক্রমা করার বদলে এখন থেকে তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়ালো সংগ্রামী জনতার সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে কথাশিল্পের আঙ্গিকে প্রণালীবদ্ধ রূপ দেওয়া। অর্থাৎ ফ্রয়েডকে বর্জন করে তিনি মার্কসকে তাঁর শিল্পশক্তির নিয়ামকরূপে গ্রহণ করলেন। মানিকের উত্তর-পর্বের রচনায় দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক রূপান্তর বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কে কী ভাবে সাহিত্যকে দেখেন তার উপরেই নির্ভর করে তাঁর সাহিত্য-বিচারের প্রকৃতি। সাহিত্যের গতানুগতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রথাবদ্ধ সমালোচকের দল মানিকের আদিপর্বের রচনাগুলিকেই সমধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁদের বিচারে 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'টিকটিকি' প্রভৃতি ছোটগল্প শিল্পোৎকর্ষের মানদণ্ডে অনেক বেশী উৎরেছে বলে তাঁদের ধারণা। আমরা তা মনে করি না। আমরা মনে করি, সামাজিক উদ্দেশ্যমূলকতার দিক থেকে তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি', 'সহরতলী' ২ খণ্ড, 'দর্পণ', 'হরফ', 'চিহ্ন', 'সার্বজনীন', 'স্বাধীনতার স্বাদ' প্রভৃতি উপন্যাস এবং উত্তর পর্যায়ের গল্প (যথা, ফেরিওয়ালা, দুঃশাসনীয়, মাসিপিসি, শিল্পী, কংক্রীট, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, টিচার, পেটব্যথা, হারানের নাতজামাই, বাগদীপাড়া দিয়ে, ওরা ছিনিয়ে খায় না কেন প্রভৃতি) অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ও লক্ষ্যভেদী। শিল্প এসব রচনায় শুধু শিল্পের স্তরে সীমিত থাকে নি, তা সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

এক কথায়, আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য কথাকারদের মত মানিক কেবল সমস্যা উত্থাপন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি সমস্যার প্রতিকারের পথও বাতলে দিয়েছেন তাঁর লেখায়। এইভাবে তাঁর বাস্তবতা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

কোথাও অর্ধপথে থেমে থাকেনি। মানিক দেখিয়েছেন, এই অসাম্য-বৈষম্য-অত্যাচার-প্রপীড়িত সমাজে সবলের হস্তে দুর্বলের লাঞ্ছনা কখনই অপরিবর্তনীয় বিধানস্বরূপ গণ্য হতে পারে না, বেঁচে থাকতে হলে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা চাই, মারের বদলে মার দেওয়া চাই। বিনা প্রতিবাদে মুখ বুজে সব সহ্য করে গেলে অত্যাচারকে উৎসাহিত করা হয়, অত্যাচারীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইতিহাসের তা কখনও অভিপ্রায় হতে পারে না।

মানিক আরও দেখিয়েছেন, মধ্যবিত্ত তথাকথিত ভদ্রলোকের সমাজ ভিতরে-ভিতরে একেবারেই ফোঁপরা হয়ে গেছে, ফাঁকি ও মেকিতে তার আগাপাছতলা ভরা। ভণ্ডামি এই সমাজের কুলচিহ্ন বললেও চলে। জোড়াতাড়া দিয়ে এই সমাজকে টিকিয়ে রাখা যাবে না, এর ধ্বংসই কাম্য। অন্যপক্ষে যাদের আমরা ছোটলোক আখ্যা দিয়ে প্রায়শঃ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখি, সেই শ্রমিক ও কৃষক সমাজের মানুষগুলির মধ্যে রয়েছে অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা। তাদের লড়াকু জীবনই তাদের অস্তিত্বের সার্থকতার সবচেয়ে বড় নিশানা। মানিক শেষের দিকে যত ছোটগল্প লিখেছেন তার সব কটিরই মূল উপজীব্য এই বক্তব্য। বিষয়বস্তুর রূপায়ণে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের প্রভাব নেই, প্রতিটি গল্পের বক্তব্য ঋজু, স্পষ্ট, জটিলতার কুয়াসা বর্জিত। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সমষ্টি জীবনের দিকে চিন্তার মোড় ফেরার ফলেই যে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমষ্টি-চেতনার মত প্রতিষেধক আর নেই। তা অনেক রোগের নিদান, অনেক অভিশাপ থেকে মুক্তির উপায়। আত্মকেন্দ্রিকতার ব্যাধিই যে অভিশাপগুলির মধ্যে প্রধান, সেকথা বলাই বাহুল্য। মানিকের শিল্প-জীবনে ফ্রয়েডীয় অপবিজ্ঞানের প্রভাব গোড়ার দিকে তাঁকে ভুল পথে চালিত করেছিল, এটা কল্লোলীয় লেখকদের প্রভাবসঞ্জাত তাৎকালিক সাহিত্যিক পরিবেশেরই ফল বলে সন্দেহ হয়; পরে ওই পথ থেকে তিনি সম্পূর্ণ সরে আসেন। বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাবে তাঁর মুক্তিস্নান ঘটে। যৌনতা নয়, অর্থনীতিই মানবীয় সমাজ-প্রবাহের মূল নিয়ামক,—এই বোধে উদ্দীপ্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর শিল্পের গতিমুখের আমূল ক্ষেত্রবদল হয়।

'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটিকে কোনও এক প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন 'জটিল-কুটিল-মননের' আশ্চর্য এক শিল্পরূপ। এ বর্ণনা সঠিক। কিন্তু ব্যক্তি-সাক্ষিক জটিল, কুটিল মননে আমাদের আকর্ষণ নেই, আমাদের আকর্ষণ

গণমানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামমথিত জীবনের ছবির প্রতি। বিবরের অন্ধকার আমাদের টানে না, আমাদের টানে সমাজের বহিরঙ্গে সমবেত মিলিত মানুষের রৌদ্রালোকিত স্পষ্ট রূপ। মানিকের শেষের দিকের লেখায় এই সুন্দর যৌথ জীবনের ছবি মূলতঃ আমরা পাই। তাঁর 'সহরতলী' দুই খণ্ড উপন্যাস শ্রমিক আন্দোলনের অনবদ্য শিল্প-দলিল; 'দর্পণ' কৃষক আন্দোলনের এক নিখুঁত প্রতিরূপ; 'চিহ্ন' দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম দশায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতার জাগরণ ও বিক্ষোভের ছবি; 'স্বাধীনতার স্বাদ' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে শ্রেণী-সচেতন সমাজের আলেখ্য। তেমনি উত্তরকালীন বিভিন্ন ছোটগল্পের মধ্যে পাই—মিলমালিক ধনিক-বণিক জোতদার প্রভৃতি অত্যাচারী শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে জনতার সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের চিত্র। 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের উৎকট বিকৃত প্রেম, 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের নিয়তিবাদ, 'অহিংসা' উপন্যাসের যৌনতা কিংবা 'সরীসৃপ' জাতীয় ছোটগল্প অথবা 'বৌ' পর্যায়ের মবিড আখ্যায়িকাগুলি থেকে এ-সকলের প্রকৃতি কতই না ভিন্ন। এই দুই বিপরীত জগতের মধ্যে 'পদ্মানদীর মাঝি' যোগসূত্ররূপে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে উভয় জগতেরই লক্ষণ বর্তমান—ব্যক্তিকেন্দ্রিক জৈব প্রেমের রোমান্সও আছে, আবার প্রখর শ্রেণী-চেতনার স্বাক্ষরও রয়েছে। এখান থেকেই মানিকের নয়া পথে যাত্রার শুরু।

মানিক-সাহিত্য বাংলাভাষায় ফ্রয়েডবাদ থেকে মার্কস্‌বাদে উত্তরণের এক মহোজ্জ্বল শৈল্পিক প্রতিরূপক। সমাজ-বাস্তবতার এমন নিখুঁত ও সুদক্ষ কলাকার এখন পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে আর দ্বিতীয় আবির্ভূত হননি।

এই পর্যন্ত ভূমিকা করে এবার আমরা মানিক-সাহিত্যের বিস্তৃততর আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের গভীরে যতই প্রবেশ করা যায় ততই দেখা যায়—এ লেখক এমন এক অসাধারণ মনের অধিকারী যার অনন্যতা তাঁর বাল্যের জীবন থেকেই স্পষ্ট। অন্য কারও সঙ্গে তার মনের গড়ন মেলে না। তাঁর সম্পর্কিত জীবনী-গ্রন্থগুলির পরিচিতি এবং অন্যান্য সূত্র থেকে আহৃত তথ্যাদি থেকে দেখা যায়—ছোটবেলা থেকেই তিনি গতানুগতিকতা বিরোধী, সাহসী, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। একদিকে দুরন্ত, চঞ্চল, বেপরোয়া, অন্যদিকে নির্জনতা-প্রিয়, একাচারী, ভাবুক। চিন্তাশীলতা তাঁর স্বভাবের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। হাস্যপরিহাসপ্রবণতা, উচ্ছলতা, স্ফূর্তিমত্ততা, উৎসাহের আধিক্য এসব তাঁর

স্বভাবের বিপরীত ছিল। বরং এক ধরনের গাম্ভীর্য, অন্তর্লীনতা, আত্মমগ্নতা, সতত তাঁর ব্যক্তিত্বকে ঘিরে থাকত, যাতে তাঁকে বাইরে থেকে ভুল বোঝার অবকাশ ছিল। সঙ্গী হিসাবে তিনি যে খুব স্পৃহনীয় ছিলেন তা বলা যায় না, বরং এই কথাই ঠিক বলা হয় যে, তাঁর সহজাত আত্মমগ্ন স্বভাব ও ভাবুকতা বন্ধুত্বকে আকর্ষণ করার পরিবর্তে প্রতিহত করতেই বেশী সাহায্য করত। উচ্ছ্বাস তাঁর আসত না, সবকিছুরই তল পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখার প্রবৃত্তি ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কারণ বিচার করে দেখার অভ্যাস তাঁর স্বভাবে এমন একটা বৈজ্ঞানিক নির্মোহ ও নিরপেক্ষতার সৃষ্টি করেছিল যে, তার সংস্পর্শে এলে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য পালাবার পথ খুঁজে পেত না। তাঁর বৈজ্ঞানিক নির্বেদ তাঁর আত্মরক্ষার একটা উপায় ছিল। কখনও কখনও সেটা দাম্ভিকতা বলে মনে হওয়াও আশ্চর্য ছিল না।

অথচ মানুষটি ছিলেন ভিতরে ভিতরে গভীর মানবপ্রেমী। মানুষের দুঃখে-দৈন্যে কাতর। অন্তরে মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন অথচ বাইরে সে মনোভাবের প্রকাশ দৃশ্যতঃ হৃদয়তাপ-বর্জিত, কতকটা শুষ্ক—এই বৈপরীত্যের যে নিয়তি অর্থাৎ ভুল-বোঝা, তার শিকার তাঁকে প্রায়শই হতে হয়েছে। পরিবারেই কি তিনি কম ভুল-বোঝার শিকার হয়েছেন? পরিবারের অন্যান্যরা তাঁকে ঠিক বুঝতে পারত না। আর এই বিমূঢ়তার মূলে ছিল তাঁর আপন প্রহেলিকাময় স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ মনোভঙ্গী।

পিতা সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে পুত্রদের সঙ্গে ছিলেন, ভাইয়েরা সকলেই মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, বিশেষ জ্যেষ্ঠাগ্রজ উচ্চ সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, তিনি ছিলেন কলকাতা আবহাওয়া আপিসের প্রথম ভারতীয় অধিকর্তা। অথচ ভায়েদের সংসারের এই স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশ এই সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসাম্য ও বৈষম্যের কারণে তাঁর অস্বস্তিকর মনে হতো এবং তার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য তাঁর প্রাণ ছটফট করত। মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাত্রা যেসকল অভ্যাস বিশ্বাস ও সংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলির কৃত্রিমতা, অসারতা ও ভণ্ডামি খুব ছোট বয়স থেকেই তাঁর চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, মানিক-সাহিত্যের অন্যতম এক স্থায়ী ভাবই হলো ফাঁকি ও মেকিতে ভরা মধ্যবিত্ত জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে এক কঠোর সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী। মধ্যবিত্ত মানসিকতার এমন আপসহীন বৈরী বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না।

এ এক অদ্ভুত মানুষ, যিনি স্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়ায় হাঁস-ফাঁস করেন এবং স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের স্তরে নেমে আসবার জন্য পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতেও দ্বিধা করেন না। বস্তুতঃ তিনি উত্তর-জীবনে তা-ই হয়েছিলেন, declassed হবার সাধনায় কার্যতও দরিদ্রের কোঠায় নিজেকে নামিয়ে এনেছিলেন। গরিবের খাতায় তিনি নাম লিখিয়েছিলেন বাধ্যবাধকতার চাপে ততটা নয় যতটা বিত্ত-কৌলীন্যের ফাঁপা আদর্শের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকাশের জন্য। কেননা মানিক সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন যে, অসাধু উপায় ছাড়া এ সমাজে কেউ ধনী হতে পারে না। একজনকে বড় হতে গেলে অন্যের পায়ের কড়া মাড়াতেই হবে, বহু মানুষের ন্যায়সঙ্গত বাঁচার দাবিকে গলা টিপে হত্যা না করে একজনার পক্ষে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমানোর কোনই সম্ভাবনা নেই এই সমাজে—এমনি মজ্জাগত অবিচার ও অন্যায়ে ভরা এই সমাজ-কাঠামো। এ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, শোষণ ও পাপ। একে ভেঙ্গে ফেলাই এর অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ।

মানিকের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে তাঁর দক্ষিণ কলকাতার ভায়েদের সংসারের বনেদী পরিবেশ ছেড়ে উত্তর কলকাতার বরানগর অঞ্চলের বস্তিগুলির গরিব পাড়ায় চলে আসা একটা রূপকের তাৎপর্য ধারণ করে। মুষ্টিমেয়ের সুখভোগের সংস্কারকে পরিত্যাগ করে এ জনমানুষের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার আন্তরিক প্রয়াসেরই এক প্রতীক। এই স্বেচ্ছাদারিদ্র্যবরণ অগণিত সাধারণ খেটে খাওয়া লোক নিয়ে গঠিত বিত্তহীন মানুষের মেলায় সামিল হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে চলে আসার দ্যোতক। গণসাহিত্য রচনা করতে হলে সত্যসত্যই গণমানুষের একজন হতে হবে এই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত এই ঘটনার অন্তর্নিহিত মনোভাব। মনোভাবটির পিছনে যে কী পরিমাণ আত্মত্যাগ ও কী কঠিন আত্মবিলোপ লুকিয়ে আছে তা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব। আমরা মুখে গোত্রান্তরণের কথা বলি, ধরতাই বুলির মত declassed হওয়ার আওয়াজ কপচাই; কিন্তু declassed হওয়া, গোত্রান্তরিত হওয়া যে কী দুঃসাধ্য ব্যাপার মানিকের দৃষ্টান্ত থেকে বোধহয় তার কতকটা আঁচ পাওয়া সম্ভব।

এই থেকেই বোঝা যাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনটি কী অসামান্য ধাতুতে গড়া ছিল। গতানুগতিকতার ধাত তাঁর একেবারেই ছিল না। ছোটবেলা থেকেই গড়পরতা চিন্তার ধারা থেকে তাঁর চিন্তা ভিন্ন রাস্তা বেয়ে চলত। এইজন্য তাঁকে আয়াস-প্রয়াস করতে হয়নি, অন্য দশজনার থেকে

আপনাকে স্বতন্ত্র প্রতিপন্ন করবার চেষ্টার লোক-দেখানো অঙ্গ এটা ছিল না ; এ ছিল তাঁর একান্ত স্বাভাবিক প্রকৃতি। চিন্তাশীলতার অভ্যাস তাঁতে সহজাত ছিল।

চিন্তা অনিয়ন্ত্রিত হলে সেটা ব্যাধির পর্যায়ে পড়ে। কথায়ই বলে 'চিন্তারোগ'। মানিকের প্রতিভার প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ করা অবশ্যই আমার অভিপ্রায় নয়, তা সত্ত্বেও বলছি তাঁর অতিরিক্ত চিন্তাপ্রবণতা পুরাপুরি তাঁর পক্ষে শুভঙ্কর হয়নি। তা কখনও কখনও তাঁকে অসুস্থতার কিনারায় নিয়ে ফেলত। তাঁর স্বীয় জবানী থেকেই আমরা জানতে পারি বালককাল থেকেই তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছিল অফুরন্ত। কার্য-কারণের রহস্য তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। প্রতিটি জিনিসের 'কী ও কেন' খুঁটিয়ে বিচার করে তার শেষ অবধি না দেখা পর্যন্ত তাঁর চিত্তের তৃপ্তি ছিল না। কি জাগতিক ঘটনা, কি মানবীয় আচরণ তার মূলে গিয়ে বিষয়টির তাৎপর্য অনুসন্ধান না করা পর্যন্ত তাঁর চিন্তার আবেশ ঘুচত না।

এই আবেশ থেকেই তাঁর প্রথম বয়সের সাহিত্যসৃষ্টিতে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের অভ্যাসের জন্ম। প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, টিকটিকি, 'বৌ'-পর্যায়ের গল্প প্রভৃতি বিভিন্ন ছোটগল্প বলুন আর জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, এমন কি পদ্মানদীর মাঝি প্রভৃতি উপন্যাস বলুন—তাঁর প্রথমদিক্‌কার বড়-ছোট প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে চিন্তার আতিশয্য প্রকট। মানুষের অন্তর্জীবন ও তৎসঞ্জাত মনস্তত্ত্বকে চিরে-ফেঁড়ে বিশ্লেষণ-ব্যবচ্ছেদ করবার প্রবৃত্তি তাঁর ভিতর এমন একটা obsession বা আচ্ছন্নতার সৃষ্টি করত যে এটা প্রায় তাঁর দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়ে পড়েছিল বললেও চলে। দ্বিতীয় স্বভাব বলছি এ কারণে যে, পরবর্তী জীবনেও তিনি এই অভ্যাস থেকে পুরাপুরি মুক্ত হতে পারেননি, যদিও মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজদর্শনের প্রভাব তাঁর এই আবেশ দূরীকরণে বহুল পরিমাণে তাঁকে সহায়তা করেছিল। সমষ্টি-চেতনার পাবক-স্পর্শে তাঁর ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনার অগ্নিশুদ্ধি ঘটেছিল।

দিবারাত্রির কাব্য একটি অসাধারণ রচনা, আপাদমস্তক প্রতিভার লক্ষণমণ্ডিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা কোনক্রমেই ভোলা যায় না যে, এই উপন্যাসেই ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের ছাপ সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট। হেরম্ব, সুপ্রিয়া, অনাথ, মালতী, আনন্দ—এ বইয়ের প্রতিটি চরিত্র অসুস্থ, অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের শিকার। কেউ তারা গতানুগতিক পথে ভাবে না, এমনকি হেরম্ব, সুপ্রিয়া ও আনন্দ—কিশোরী আনন্দ—প্রেম করতে গিয়েও প্রেমের বাজার-চলতি

ধারণার সম্পূর্ণ অবশ থাকে। এই তিন চরিত্র যেহেতু অস্বাভাবিক চিন্তন-প্রণালার সাহায্যে নিজ নিজ ধারায় প্রেমের মনোমত ব্যাখ্যা দেয় সেই জন্যই যেন আরও বেশী করে তাদের কথায় ও আচরণে মৌলিকতার লক্ষণ সবিশেষ প্রকাশ পায়।

তবু বলব দিবারাত্রির কাব্য মবিড স্তরের রচনা। এই উপন্যাসে মানিকের যে-মন কাজ করেছে তা উচ্চপর্যায়ের শিল্পীর প্রতিভাযুক্ত হলেও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের প্রভাবে অতিমাত্রায় জটিল কুটিল-বক্র। বইটিতে যথেষ্ট কাব্যের স্বাদও পাওয়া যায়, সেইদিক থেকে উপন্যাসটি সার্থকনামা। তথাপি বলতে হয় দিবারাত্রির কাব্যে মানিক যে-জাতীয় শিল্পরস পরিবেশন করেছেন তার আমরা নিতান্ত অনুরাগী নই। এ বইয়ে তাঁর যে চিন্তাশীলতার পরিচয় আমরা পাই তা আমাদের যথেষ্ট ভাবায় বটে, এমনকি মনের ভিতর এক ধরনের অস্বস্তিকর দার্শনিকতারও জন্ম দেয়, কিন্তু আমাদের কোন স্থির লক্ষ্যে উপনীত করে না।

পুতুলনাচের ইতিকথা আর একটি উপন্যাস, যা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার চিত্রণে অন্তর্ভেদী শিল্পদৃষ্টির পরিচায়ক। তবু এখানেও ফ্রয়েডপ্রভাবিত ব্যবচ্ছেদী মননক্রিয়ার আতিশয্য আছে। এই বইয়েও প্রচুর সহজ দার্শনিকতা আছে, গ্রামের মানুষ ব্যবহারিক জীবনযাপনের পাশে পাশে সমান্তরাল রেখায় লোকচক্ষুর অগোচর আর একটি যে চিন্তাজীবন যাপন করে—শশী, কুসুম, কুমুদ-মতি, গোপাল প্রভৃতি চরিত্রের মননধারার মধ্যে তার পরিচয় ধরে দেওয়া হয়েছে গভীর শিল্পোৎকর্ষের সঙ্গে। পাঁচহাজার বছরের সনাতন ভারতীয় সভ্যতার চিন্তাশীলতার ঐতিহ্য কৃষির সংস্কার লালিত সাধারণ গ্রামীণ নরনারীর মধ্যেও যে কা অসামান্য ভাবুকতার সৃষ্টি করে এই বইয়ের চরিত্রগণগুলির মধ্যে তার অশেষ নিদর্শন মিলবে। কুসুমের চরিত্র একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। শশীর দোলাচলচিত্ততার মধ্যে পাওয়া যায় নাগরিক বহির্জীবন ও ঘরকুনো গ্রাম্য-জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের টানাপোড়েনে আলোড়িত-মথিত এক অসহায় মানুষের ছবি। ভবিতব্যবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই দোলাচলচিত্ততা, সুতরাং অশ্রদ্ধেয়।

সমালোচকদের বিচারে পুতুলনাচের ইতিকথা মানিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, কিন্তু আমরা যে মানদণ্ড বিচারের মাপকাঠি হিসাবে আমাদের সামনে খাড়া করেছি তার নিক্তিতে ওজন করে দেখলে একে আমরা আদর্শ সৃষ্টি বলতে পারিনে। এতে আস্বাদনীয় শিল্পরস ও প্রণিধানযোগ্য চিন্তাশীলতা আছে প্রচুর কিন্তু উভয়ই নিয়তিবাদের দ্বারা খণ্ডিত। সনাতন ভারতীয় অদৃষ্টতত্ত্ব এই

উপন্যাসে চরিত্রগুলির চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে। মানুষ যদি অদৃশ্যশক্তির সুতোয় নাচানো খেলার পুতুলই হবে তবে আর তার স্বাধীন ইচ্ছার দাম রইলো কী?

আসলে মানিক তখনও পথ খুঁজে পাননি। ব্যক্তিবাদ আর সমাজবাদের মধ্যরাস্তায় তিনি সঠিক পথের সন্ধানে এদিক-ওদিক হাতড়ে ফিরছেন। এর পরের রচনা পদ্মানদীর মাঝি। কিন্তু সেখানেও তিনি ব্যক্তিবাদের কবল থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাননি। হতদরিদ্র জেলে সম্প্রদায়ের দুঃখে অমিত বেদনার অনুভূতির পাশে জৈব কামনা-বাসনার অভিব্যক্তি আর অবাস্তব উপনিবেশ স্থাপনার রোমান্টিক কল্পনার রূপায়ণ বইটিতে একটি অনুপাত-অতিরিক্ত জায়গা জুড়ে বসেছে। কপিলার প্রতি কুবেরের দেহজ আকর্ষণের স্বাভাবিকতা হয়ত অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু হোসেন মিঞার নোয়াখালির সন্দীপের চরে জেলেদের নিয়ে কলোনী স্থাপনার পরিকল্পনা একটা ইউটোপীয়ান স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। মানিকের মত পরিণত মননের মানুষের কল্পনায় এ জাতীয় নাইভিটি জায়গা পেলো কী করে ভাল বোঝা যায় না। তবে পদ্মানদীর মাঝিতেও বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সহজ দার্শনিকতার সংস্কার পূর্ণরূপে বিদ্যমান। পদ্মানদীর জেলে-মালোরা স্বতই শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত, অজ্ঞ, তবু এক ধরনের সহজাত চিন্তাশক্তি থেকে তারা বঞ্চিত নয়। এ শক্তি ভারতের ঋষির সংস্কারের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত বললেও চলে।

আসলে মানিকের সাহিত্যে যে-সহজ দার্শনিকতা ও ভাবুকতার পরিচয় পদে পদে দেখতে পাওয়া যায় তা তাঁরই মনের প্রক্ষেপ। প্রথম জীবনে ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান তত্ত্বের প্রভাবে তা আত্মকেন্দ্রিক বিকৃতির পথে চলেছিল, পরে মার্কসীয় বিজ্ঞানের আরোগ্য-ক্ষমতার কল্যাণে তা সুস্থ পথে সংস্থিত হয়। মানিক আত্মস্থ হয়ে ওঠেন। তবু তিনি জন্ম-ভাবুক। জন্ম-দার্শনিক। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তাঁর এই মানসিক বৈশিষ্ট্যকে আরও তীক্ষ্ণতর করে তুলেছিল মাত্র। সোনার চেয়ে দামী তাঁর উত্তর-জীবনের উপন্যাস। সেখানে ব্যক্তি-চেতনাকে দাবিয়ে গণ-চেতনার কথাটাই বিশেষভাবে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু সেখানেও মানিক এক জায়গায় বলছেন: "সব মানুষেরই দর্শন আছে, দার্শনিক আলোচনা ছাড়া কোনও মানুষের চলে না। জীবনদর্শন ছাড়া মানুষের জীবন নেই কোন স্তরের। হয়তো সেটা পণ্ডিতদের দর্শন নয়, ছাঁকা তত্ত্বের জটিল দর্শন নয়। নিজেরই জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা শিক্ষা দীক্ষা সংস্কারের দর্শন, নিজের

জীবন আর জগৎটার একটা নিজের বোধগম্য মানে খাড়া করার দর্শন।" এই জাতীয় দর্শন মানিকের মানস-গঠনের ভিতর বিলক্ষণ মাত্রায় ছিল এবং প্রথম থেকে শেষাবধি আগাগোড়া তাঁর জীবনকে অধিকার করেছিল তার প্রমাণ তাঁর সাহিত্য। তবে প্রথম বয়সের তুলনায় শেষের দিকে তার প্রভাব কমে এসেছিল এবং মার্কসীয় বিজ্ঞানের বহির্মুখ সমষ্টি-চেতনার ঝোঁক তার প্রথম বয়সের আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতিষেধক হয়েছিল। বহু মানুষের কল্যাণের চিন্তা যখন মনের মধ্যে প্রবেশ করে তখন আপনাকে কেন্দ্র করে আপনি আবর্তিত হওয়ার যে অন্তর্নিবেশমূলক অভ্যাস ব্যক্তিকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে দেয় তার থেকে তার মুক্তি ঘটে। মানিকের জীবনে ও সাহিত্যে শেষের দিকে এমন মুক্তি ঘটেছিল। ফ্রয়েডবাদ থেকে মার্কসবাদে উত্তরণ তাঁর চিন্তার গতিপথ সুস্থখাতে চালিত করেছিল, তাঁর দার্শনিকতাকে কলুষমুক্ত করেছিল।

অবশ্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে, মানিক মূলতঃ সাহিত্যিক, শিল্পী গোত্রের মানুষ, অ্যাকাডেমিক মেজাজের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক নন। উত্তর-জীবনে তিনি মার্কস-এঙ্গেলস-এর গ্রন্থাবলী নাড়াচাড়া করলেও তার থেকে কতটা চিন্তার ডিসিপ্লিন আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন বলা শক্ত। অথবা, বিজ্ঞানের 'কী ও কেন' নিয়ে তিনি সবিশেষ ভাবিত ছিলেন বলে প্রায়ই যে-আত্মপ্রসাদের ভঙ্গীতে প্রচার করতেন সে-আত্মপ্রসাদও যথেষ্ট সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কিনা সন্দেহ। সত্যি কথা বলতে, যথার্থ বিজ্ঞানের জগৎ থেকে তিনি বহু, বহু দূরে অবস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর একটা তাজা ধরনের কাচা কৌতূহল ছিল মাত্র, বিজ্ঞানের প্রণালীবদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা অনুশীলনের সুযোগ বা সামর্থ্য তাঁর ছিল না।

আসলে তিনি ছিলেন একান্তভাবেই শিল্পী—কিতাবী ধারার বাইরের জগতের মানুষ। অ্যাকাডেমিক শৃঙ্খলা বা পরিচ্ছন্নতা তাঁর ছিল না সে তাঁর ভাষার অগোছালো আদল দেখলেই বোঝা যায়। বোঝা যায় চিন্তার কম-বেশী অসংলগ্ন ভঙ্গী থেকে। তবু এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক অসামান্য প্রতিভাধর সাহিত্যিক। তাঁর ভাববার ধরনটাই আর দশজনার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গতানুগতিকত্বের লেশমাত্র ছিল না তাঁর স্বভাব বা ব্যক্তিত্বের মধ্যে। তিনি ছিলেন সহজাত প্রতিভার অধিকারী; প্রতিভাই তাঁকে আর সকলের থেকে আলাদা করে গড়ে তুলেছিল।

তবে প্রতিভা কাঙ্ক্ষণীয় গুণ হলেও তার বিপদও আছে। প্রতিভা প্রায়ই ব্যক্তিবাদের বদ্ধজলায় ঠেকে সমাজজীবনের বৃহত্তর স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে যায়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, মানিকের বেলায় এটা ঘটেনি। বরং ওই প্রতিভারই দৌলতে তিনি উত্তরোত্তর জনজীবনের কাছাকাছি চলে এসেছেন—অগণিত নিপীড়িত শোষিত ভাগ্যহত মানুষের মুক্তির স্বপ্নকে তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রথম বয়সের লেখায় আত্মকেন্দ্রিকতার ঝোঁক ছিল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী প্রতিভাসুলভ সমাজবিচ্ছিন্নতার মেজাজ ছিল—এই দুই অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে তিনি জনমানসের সন্নিকট হয়েছেন, অত্যাচারিত অপমানিত লাঞ্ছিত মানুষের দুঃখের অবসানকেই তাঁর সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য বলে মেনেছেন। তাদের মুখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের ভাষা জোগাতে গিয়ে নিজের দুঃখকষ্টের কথা ভুলেছেন, তাদের সঙ্গে আপনাকে সম্পূর্ণ একাত্ম করে দিয়েছেন। গণনাহীন আর্তপীড়িত মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে নিজ ভাগ্যকে এরূপ মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সচরাচর প্রতিভার বিপরীতধর্মী ব্যাপার কিন্তু মানিকের প্রতিভার এখানেই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর প্রতিভা ক্রমশঃ ওই বিরল পথ বেয়েই অগ্রসর হয়েছিল এবং এক সময়ে তিনি গোত্রান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন।

'শহরতলী' দুই খণ্ড মানিকের উপন্যাসগুলির মধ্যে খুবই সমাজসচেতন রচনা, আমার বিবেচনায় তাঁর অন্যতম সর্বোত্তম উপন্যাস। অথচ এই বই দুখানি তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত হবার আগেই লিখেছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায় তাঁর মন ফ্রয়েডীয় কুহকের জাল কেটে ক্রমেই গণমুখী চেতনার অভিমুখে অগ্রসর হয়ে চলেছিল এবং সংগ্রামকেই জীবনের মুখ্য আদর্শের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবার কিনারায় এসে পৌঁচেছিল। অন্যায় মুখ বুজে সয়ে যাওয়া মৃত্যুর সামিল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোতেই মনুষ্যত্ব ও বেঁচে থাকার সার্থকতা—এই বোধে মানিকের রচনা উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এই পর্ব থেকেই।

যশোদা বাংলা সাহিত্যে একটি আশ্চর্য চরিত্র—এমনতর চরিত্রের কোন পূর্ব-নজীর নেই বাংলা গল্পোপন্যাসের জগতে। পরেও এই শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে কিনা সন্দেহ। যশোদা শহরতলীর একটি পাইস হোটেলের মালিক। গরীব গরবা খেটে-খাওয়া মেহনতী শ্রেণীর লোকেরা তার হোটেলে খেতে আসে। এদের কেউ কারখানার ফিটার মিস্ত্রি, কেউ লেদ-মেসিনে কাজ করে, কেউ কারখানার হাজিরা-রক্ষক, কেউ আর কিছু। গ্রাম থেকে ছিটকে আসা বিগতযৌবনা এই স্থূলকায়া প্রৌঢ়া রমণীর কাছে তার ভাতের হোটেলের খদ্দেররা নিছক খদ্দের নয়, তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গেও তার আত্মীয়তার যোগ। শুধু

তাই নয়, কারখানার মালিকের সঙ্গে বিরোধে যশোদার সুস্পষ্ট পক্ষপাত তার খদ্দের শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার প্রতি। মায়ের স্নেহে সে এদের সংরক্ষণ করে; এদের মধ্যে কেউ নেশায় কিংবা অন্য দোষে বেচাল হলে তাকে ভর্ৎসনা করে সুপথে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সে তাদের হয়ে কারখানা-মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়েছে। সে-ই শ্রমিকদের নেত্রী।

সহরতলী এক অসাধারণ উপন্যাস। এই রচনার সাক্ষ্য থেকেই প্রথম সংশয়াতীতরূপে বুঝতে পারা গেল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর পূর্বের মত ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের কায়দায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক অন্তর্নিবেশচর্চায় উৎসাহী নন, ইতোমধ্যে তাঁর মনোযোগের ক্ষেত্রবদল হয়ে গিয়েছে, তিনি সমষ্টিচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। সমাজকল্যাণভাবনা তাঁর শিল্পচর্চার এক প্রধান উপজীব্য পরিণত হয়েছে।

এই পর্ব থেকেই মানিকের শিল্পের এক নয়া চেহারা। সেটা দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তের কবলে পড়ে বাঙালী সমাজে ইতোমধ্যে প্রচণ্ড ওলট-পালট ঘটে গিয়েছে। গ্রামের চাষীজীবন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, মৃত্তিকা থেকে উৎপাটিতপ্রায়। শহরের কল-কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁচেছে, তারা বিক্ষোভে-বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চাইছে। যুদ্ধের বিপর্যয়কর আঘাতে-সংঘাতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের লালিত মূল্যবোধগুলির অনেক কটিরই ভরাডুবি ঘটতে চলেছে, প্রাণান্তকর অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে তাদের সনাতন নীতিবোধ ধূলিসাৎ হবার উপক্রম। টিঁকে থাকাই যেখানে সমস্যা, সেখানে ভদ্রলোকশ্রেণীর 'ভদ্রলোকী' চালচলন প্রকৃত অবস্থা ঢাকবার পোশাকী আবরণ মাত্র হয়ে উঠেছে, তার বেশী কিছু নয়—তাদের জীবনযাত্রা ফাঁকি ও মেকিতে ভরে উঠেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ভেদী শিল্পদৃষ্টিতে বাংলার এই হতদশা গোপন থাকেনি—তাঁর গভীর পর্যবেক্ষক চোখ বাইরের খোলস ডিঙিয়ে সমাজের তল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায় এই পর্যায়ে আর তিনি আত্মলীনতায় আবদ্ধ নন, ব্যক্তির অচেতন মনের অন্ধকার গলিঘুঁজিতে ঘুরে ব্যক্তিক আচরণের ব্যাখ্যা সন্ধান করবার 'মর্বিড' কৌতূহলের নিবৃত্তি আর তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। মানুষের মনোলোকের অন্ধকার থেকে বাইরের রৌদ্রালোকে বেরিয়ে এসে তিনি সমষ্টি-জীবনের মধ্যে তাঁর শিল্পের উপকরণ—চিত্র ও চরিত্র—খোঁজার কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন। অন্তর্মুখী মন বহির্মুখী হয়ে

উঠেছে। তাঁর সাহিত্যে বিবরের অন্ধকার ঘুচে গিয়ে চরিত্রগুলি বাইরের আলোয় ভেসে উঠেছে।

বহির্মুখীনতাকে সচরাচর আমরা একটু খাট দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত, অন্তর্মুখীনতাকে সেই তুলনায় অনেক বেশী মূল্য দিয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সমষ্টিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বহির্মুখীনতা মন্দ অভ্যাস নয় বরং বাঞ্ছিত একটি গুণ। তা অতিরিক্ত চিন্তারোগের প্রতিষেধক এবং কার্যশক্তির উজ্জীবক। তা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার অবলোপকারী সুস্থ সামূহিক এক প্রবণতা।

একে একে তিনি লিখলেন অহিংসা, দর্পণ, হরফ, জীয়ন্ত, চিহ্ন, স্বাধীনতার স্বাদ, শুভাশুভ, সোনার চেয়ে দামী, সার্বজনীন, হলুদ নদী সবুজ বন প্রভৃতি উপন্যাস। প্রত্যেকটি উপন্যাসে কম বা বেশী পরিমাণে গণচেতনা তথা সংগ্রামী মনোভাবের স্বাক্ষর স্পষ্ট। সেইসঙ্গে রচিত হলো তাঁর মধ্য ও শেষ পর্যায়ের অনবদ্য ছোটগল্পগুলি—অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধই যেগুলির প্রাণ। যেমন হারানের নাতজামাই, পেটব্যথা, বাগদীপাড়া দিয়ে, মাসি-পিসি, টাচার, কংক্রীট, শিল্পী, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, ওরা ছিনিয়ে খায় না কেন, ইত্যাদি। ফেরিওয়ালা আর দুঃশাসনীয়, ভিন্ন রসের গল্প, যুদ্ধকালীন বস্ত্রসংকটের দুই মর্মান্তিক করুণচিত্র, বেদনার আর্তিতে বিষাদ-বিধুর কিন্তু সেখানেও প্রতিরোধের ইঙ্গিত আছে।

মোট কথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেতনায় যে সংগ্রামের ভাবাদর্শ, লড়াকু মনোভাব খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছে উত্তরকালীন এইসব গল্প আর উপন্যাসের মধ্যে তার অসংশয় পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠক আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন, এই পর্বের রচনায় ব্যক্তিমানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিকলন আর তাঁকে আকর্ষণ করতে পারছে না; সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যাগুলি তাঁর চোখে ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীদের অবদমন-অত্যাচার শোষণের পিঠে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের চিত্র তাঁর লেখায় উত্তরোত্তর বেশী মাত্রায় জায়গা জুড়তে শুরু করেছে। একদিকে মালিকের অনিচ্ছুক হস্ত থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার লাভের লড়াই, অন্যদিকে জমিদার-জোতদার-মহাজনদের জোটবদ্ধ নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে গ্রামের কৃষকশ্রেণীর রুখে দাঁড়ানোর ঘটনাবৃত্তে মিলে মানিক-সাহিত্যে বলতে গেলে এখন থেকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ঘটনার সারিবদ্ধ মিছিল চোখে পড়তে লাগলো। সেইসঙ্গে চললো শহরে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের 'ভদ্রলোগামির' মুখোশটি খুলে ধরার ক্ষমাহীন প্রক্রিয়া। এই পচনশীল ঘুণে-

ধরা 'লখ্‌ঝর' সমাজব্যবস্থাটাকে রিফুকর্ম করে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টায় যে কারও কোন লাভ নেই, তাকে ভেঙে ফেলাই সকলের পক্ষে মঙ্গল—এই বিপ্লবী বাণীই হয়ে উঠলো তাঁর নূতন পর্যায়ের রচনাগুলির মূল অম্বিষ্ট। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ছিল তাঁর অমলিন সাহিত্য-বেদ।

আর একটি প্রসঙ্গের উপর দৃষ্টি সঞ্চালন করেই এই আলোচনা শেষ করবো।

কেউ কেউ বলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন লেখার ভিতর দেহবাদী প্রবণতার লক্ষণ বেশ কিছু মাত্রায় ফুটে উঠেছে, রুচির বিকৃতির দায়ে সেগুলিকে ধিক্কার জানানো উচিত। অশ্লীলতা অপসংস্কৃতির একটা স্বীকৃত দিক এবং অপসংস্কৃতি একটা নিন্দনীয় ব্যাপার। তা যদি হয় তাহলে সেই নজীরে মানিকের সংশ্লিষ্ট রচনাগুলিকেই বা নিন্দনীয় জ্ঞান করা হবে না কেন। একই দোষের দুই ধরনের বিচারের মান কি থাকা উচিত?

এর উত্তরে বলবো কে কী উদ্দেশ্যে সাহিত্যে দেহবাদের ব্যবহার করে তাই দিয়েই সেই দেহবাদের মূল্যায়ন হলে ভাল হয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকেও তো কোন কোন জায়গায় রুচির আশালীনতা আছে। কই, তাই নিয়ে তো আজ আর কারও মনে প্রশ্ন জাগে না। কেন না ওই অংশগুলি 'নীলদর্পণ' নাটকের উদ্দেশ্যের সততা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব প্রদর্শনের লক্ষ্যের সঙ্গে আশ্চর্য মানিয়ে গেছে। ক্ষেত্রমণির উপর রোগ সাহেবের বলাৎকার চেষ্টার দৃশ্য না দেখালে নীলকর সায়েবদের অত্যাচারের মাত্রা দেখানো হয় না। সংলাপের অশালীনতাও একই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত।

মানিকের রচনাকেও একই মানদণ্ডে বিচার করতে হবে। সত্য বটে তাঁর দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, অহিংসা, দর্পণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি উপন্যাসের এখানে সেখানে রুচির মালিন্য কিছু কিছু প্রবেশ করেছে কিন্তু মানিক সেগুলির অবতারণা করেছেন কী উদ্দেশ্যে? নিশ্চয় তথাকথিত বিবরবাদী লেখকদের অর্থকরী মনোভাবের তাগিদে নয়। অশ্লীল রচনার টোপ ফেলে পাঠকদের প্রলুব্ধ করার স্থূল প্রক্রিয়া এক কথা, আর সমাজের প্রকৃত রূপের উদ্‌ঘাটন করে পাঠকের মনে বিপ্লবের প্রেরণা জাগানো আরেক কথা। মানিক চেয়েছিলেন এই পচা-গলা সমাজের বীভৎস চেহারার উন্মোচন করে এই ইঙ্গিত দিতে যে, এই পদে পদে অসাম্য-বৈষম্য-অন্যায়-প্রপীড়িত জীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস হয়ে যাওয়াই উচিত, জোড়াতাড়া দিয়ে একে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। মানিক পুঁজিবাদী সমাজের

সমাধিভূমির অস্থিচূর্ণের উপর সমসমাজের ভিত্ তৈরী করার মহৎ লক্ষ্যে তাঁর লেখনীকে নিয়োজিত করেছিলেন বলেই কখনও কখনও অপ্রিয় প্রয়োজনে তাঁকে সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের ছবি দেখাতে হয়েছে। তাঁর সেই চেষ্টা আর অপসংস্কৃতির বেসাতিওয়ালাদের চেষ্টাকে এক করে দেখলে মানিকের সুমহান্ প্রতিভার অবমাননা করা হয়। তা নিশ্চয়ই কারও কাম্য নয়।

প্রথম পর্বের তিনটি বিশিষ্ট উপন্যাস

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিক্‌কার তিন বিশিষ্ট উপন্যাস হলো: ১. দিবারাত্রির কাব্য; ২. পুতুলনাচের ইতিকথা; ও ৩ পদ্মানদীর মাঝি। এর মধ্যে প্রথমোক্ত উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে; পরের দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে। এই তিনখানি উপন্যাস ছাপা হয়ে বেরবার আগে মানিকের আর একখানি মাত্র উপন্যাস মুদ্রিত আকারে প্রকাশ পায়— জননী (১৯৩৫)। তবে জননী প্রথম উপন্যাস হলেও এর বৈশিষ্ট্য এমন নয় যে, একে প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসরাজির মধ্যে ফেলা যায়। মানিকের স্বভাবসুলভ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-প্রবণতা এই উপন্যাসখানিরও মূললক্ষণ তবে তা এরূপ স্তরের নয় যা পরবর্তী তিনখানি উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক কুশলতার সমপর্যায়ভুক্ত গণ্য হতে পারে। সুতরাং প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বলতে উপরের নামীয় তিনখানি উপন্যাসের দিকেই বিশেষভাবে অঙ্গুলিক্ষেপ করা বিধেয়।

এই বইয়ের আলোচনার একাধিক স্থলে দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা আর পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসত্রয়ীর বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে পাঠক দেখতে পাবেন। তবে সে সব মন্তব্য প্রাসঙ্গিক উল্লেখের বোধে কৃত, তাই কিছুটা ছাড়া ছাড়া ও সংক্ষিপ্ত এবং উদাহরণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বিধায় উদাহরণ দেওয়ার কাজ সারা হয়ে গেলেই প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে তেমন নয়। এখানে এই তিনটি বইয়ের উপরেই বিশেষভাবে মনোযোগ অর্পণ করা হয়েছে। তিনটি উপন্যাসেরই কাহিনীর রূপরেখা এখানে দেওয়া হলো। এ থেকে পাঠক বই তিনখানির প্রকৃতি কতকাংশে অনুধাবন করতে পারবেন।

দিবারাত্রির কাব্য

এই উপন্যাসটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম 'দিনের কবিতা', দ্বিতীয় ভাগের নাম 'রাতের কবিতা', তৃতীয় ভাগের নাম 'দিবারাত্রির কাব্য'। শেষ ভাগের নামেই উপন্যাসের নাম। প্রত্যেক ভাগের মুখবন্ধ রূপে একটি করে কবিতা দেওয়া আছে—লেখকের স্বরচিত কবিতা। বইয়ের নাম, অংশ-গুলির নাম এবং এই তিন কবিতার সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা চলে লেখক এর মধ্যে জেনেশুনে কাব্যস্বাদ আনতে চেয়েছেন।

লেখকের এই অভিপ্রায়ের সঙ্গে পাঠকের অভিজ্ঞতার বেমিল হবে। কারণ

নেই, কারণ সত্যিই এই উপন্যাসের ছকে এখানে-সেখানে কবিতা ছড়িয়ে আছে। তবে মধুর কবিতা নয়, কটুস্বাদ কবিতা। কাব্যের মাধুর্যরস এই কাহিনীতে গাঁজলা তুলে ফেনায়িত হয়ে উঠেছে যৌনতার আধিক্যে। ফ্রয়েডীয় নির্জ্জান কামনা-বাসনার রূপায়ণের ছাঁচে উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলির অবচেতন লুব্ধতার ছবি এতে এত বেশী তুলে ধরা হয়েছে যে, প্রেম আর প্রেম থাকেনি, দেহবাসনার আতিশয্যে বিকৃতির আঘাটায় মুখ থুবড়ে গিয়ে পড়েছে। প্রেম এখানে বিকৃত, অস্বাভাবিক, অসুস্থ।

সব চাইতে অসুস্থ চরিত্র উপন্যাসের নায়ক হেরম্ব স্বয়ং। তার মন জটিল-কুটিল কিম্ভূত। গড়পরতা সাধারণ মানুষের মত চিন্তা করবার ধাতই তার নয়, তার মনের গতি বিচিত্র। লৌকিক অর্থে আমরা যাকে প্রেম-ভালবাসা বলি তার প্রতি তার কোন আকর্ষণই নেই, তার চোখে প্রেমের ব্যঞ্জনা অন্যরকম। যে-প্রেমের মধ্যে বিকৃতির নিষিদ্ধতার ও অদ্ভুতত্বের উপাদান নেই, তেমন প্রেম তাকে টানে না। হেরম্বের স্বভাবের এই দিকটার আসল স্বরূপ বোঝাবার পক্ষে এই বলাই যথেষ্ট যে, তার স্ত্রী তার ব্যক্তিত্বের উদ্ভটত্ব সইতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সেই থেকে বিপত্নীক হেরম্ব বিবাগী বাউল, স্ত্রীর শোকে নয়, স্বীয় স্বভাবের লক্ষ্যহীনতার কারণে এবং জীবনের কোন মানে খুঁজে না পাওয়ার ব্যর্থতায়। সে এখান থেকে ওখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। এইরকম এক ভ্রাম্যমাণ পর্বে সে এসে ওঠে এক রাত্রির অতিথি হয়ে সুপ্রিয়াদের সংসারে। সুপ্রিয়ার স্বামী অশোক দারোগা। সুপ্রিয়া একদা হেরম্বকে ভালবাসত কিন্তু হেরম্ব সুপ্রিয়াকে আমল দিত না। তার খাপছাড়া নিরুত্তাপ স্বভাব সুপ্রিয়ার ভাবাবেগে সাড়া দেবার বদলে বিব্রত বোধ করত বেশী। অবশেষে হেরম্ব সুপ্রিয়াকে এড়াবার কৌশল হিসাবে নিজে উদ্যোগী হয়ে অশোকের সঙ্গে সুপ্রিয়ার বিয়ে দেয়। কিন্তু হেরম্ব এইভাবে সুপ্রিয়ার কবল থেকে মুক্তি পেলেও সুপ্রিয়া কিন্তু হেরম্বকে ভুলতে পারে না। সে মনে মনে আজও হেরম্বের ধ্যান করে। অশোকের সঙ্গে বিবাহিত জীবনে প্রত্যাশিত দাম্পত্য সুখ না পেয়ে সুপ্রিয়া মদ ধরে এবং মদের মধ্যে দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করে।

আজ হেরম্ব স্বয়ং তার দ্বারে উপস্থিত। সুপ্রিয়া নানা ছলাকলায় হেরম্বের হৃদয় আকর্ষণের চেষ্টা করে কিন্তু হেরম্ব নিষ্প্রাণ, নিরুৎসুক। অবশেষে অন্তরের জ্বালা সইতে না পেরে সুপ্রিয়া রাত্রির অন্ধকারে হেরম্বকে আত্মদান করবার জন্য হেরম্বের ঘরে যায়। হেরম্ব তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করে

ছ'মাসের মধ্যে আবার দেখা হবে আশ্বাস দিয়ে ভোরেই অশোকদের বাড়ী থেকে কেটে পড়ে। এইখানেই প্রথম ভাগের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় ভাগের সূচনায় হেরম্বকে দেখা যায় পুরীর সমুদ্রতীরে। সেখানে বহু বৎসরের ব্যবধানে পুনরায় দেখা হয়ে যায় অনাথ ও মালতীর সঙ্গে। অনাথ একদা মালতীর গৃহশিক্ষক ছিল। দুয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মাতে মালতী অনাথের হাত ধরে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। মালতী এখন এক পুরীর মন্দিরের পূজারিণী, ভক্তদের প্রণামীতে তার ও তার স্বামীর ও তের বছরের একমাত্র কিশোরী কন্যা আনন্দের গ্রাসাচ্ছাদন চলে। অনাথ কিন্তু এখন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। সে সর্বক্ষণ যোগধ্যান করে কাটায়, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনায় তার জীবন অতিবাহিত হয়। সংসারের প্রতি সে নির্মমভাবে উদাসীন, মালতীর প্রতিও সে পুরাপুরি বিমুখ। মালতীর হৃদয়ে অনাথের এই ঔদাসীন্য শেলের মত বাজে কারণ মালতী আজও অনাথকে তীব্রভাবে ভালবাসে ও তার সঙ্গ কামনা করে। স্বামীসুখবঞ্চিতা মালতীর এখন মদই প্রধান আশ্রয়। মালতীর চোখে সেটা হলো কারণবারি, মন্দিরের পূজার অন্যতম উপচার। (এখানেও মদ। মানিকের লেখায় এ প্রসঙ্গ বারে বারে না এসেই পাবে না—লেখক।) আনন্দ তার বাপ-মার এই অস্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্কের নিষ্করুণতার জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়ে নিষ্কলুষ কিশোরীর স্বভাব অনুযায়ী ফুলের মত বেড়ে উঠতে গিয়েও নিরানন্দের বিষবাষ্পে থেঁতলে-দুমড়ে যায়। সে বিষণ্ণতার প্রতিষেধক হিসাবে নৃত্যকে তার প্রাণস্ফূর্তির উজ্জীবক হিসাবে অবলম্বন করে। সে প্রায়ই মন্দিরে নাচে। পূর্ণিমার রাত্রিতে তার নাচ হয় দেখবার মত।

হেরম্ব যে কত বড় বিকৃত মানসিকতার লোক তার প্রমাণ মেলে যখন দেখা যায় সে এই আনন্দকেই মনেপ্রাণে কামনা করতে আরম্ভ করে। আনন্দকে দেখে তার ঘুমন্ত প্রেমিক সত্তা জেগে ওঠে। যে-ব্যক্তি সদাআত্মসমর্পণে উন্মুখ সুপ্রিয়ার দিকে ফিরেও তাকায়নি, মালতীও যার মন কাড়তে পারেনি, সে কিনা শেষ অবধি একটি তেরো বছরের কিশোরী মেয়ের প্রেমে ডগমগ হয়ে পড়লো। হেরম্বের এই কিশোরী-ভজনা পরবর্তীকালীন রচনা 'লোলিটা' উপন্যাসের কিশোরী-ভজনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দুই-ই সমান অশ্রদ্ধেয়, সমান দুষ্ট।

তৃতীয় ভাগে পাই এক জটিল-কুটিল-ক্লিন্ন সংসারের পাকেচক্রে পড়ে একটি সরলা কিশোরীর নৃত্যভঙ্গিমা প্রদর্শনের ছলে অগ্নিতে আত্মাহুতি। হেরম্বের আমন্ত্রণে সুপ্রিয়া কিছু দিনের জন্য পুরী বেড়াতে আসে। এসে হেরম্ব আর

আনন্দের ঘনিষ্ঠতা দেখে ঈর্ষান্বিতা হয়। সে পুনরায় হেরম্বকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করে কিন্তু হেরম্ব অবিচল। এদিকে মালতী ও অনাথের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। হেরম্ব আনন্দকে বিয়ে করবে বলে মালতীকে কথা দিয়েছিল। আনন্দ ঘুমের ভান করে মায়ের সঙ্গে হেরম্বের ওই বাক্যালাপ শুনে ফেলেছিল। আনন্দ কিন্তু এই সম্ভাবনায় উল্লসিত হয় না বরং বিষণ্ণই হয়। বিবাহবন্ধনের মধ্যে প্রেমের আটপৌরে রূপ তার কল্পনাকে মোটেই উজ্জীবিত করে না। পরিণামের কথা আগেই বলা হয়েছে। দুঃখজনক পরিণাম। দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের এখানেই পরিসমাপ্তি।

উদ্ভট, অবিশ্বাস্য, অসম্ভাব্য বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি উপন্যাস। শিল্পকর্ম হিসাবে এ রচনায় প্রতিভার পরিচয় আছে কিন্তু প্রতিভার গতি উৎকেন্দ্রিকতার অভিমুখে। প্রেমের সুস্থ, সুন্দর চিত্র এতে নেই, আছে বিকৃতির ছবি। অস্বাভাবিক যৌনতার অভিব্যক্তিতে মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ প্রায়ই অসুস্থতার ধার ঘেঁষে গেছে। হেরম্ব একটি কিম্ভূত চরিত্র, অ্যাবনর্মাল, পাগলাটে, কতকটা অসামাজিকও বটে। এমন চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা শিল্পের প্রয়োজন হয়ত বা কিছু মেটানো যায় কিন্তু জীবনের প্রয়োজন মেটানো যায় না। এ প্রতিভার খাপছাড়া ক্ষ্যাপামির এক নিদর্শন। ফ্রয়েডীয় যৌনতার হদ্দ করে ছাড়া হয়েছে এই উপন্যাসে—যা কিনা এই অধ্যায়ের লেখায় মানিকের উপর কল্লোলীয় লেখকদের চূড়ান্ত অপপ্রভাবের দ্যোতক। তথাকথিত ফ্রয়েডবাদ লেখক হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈপ্লবিক সত্তার কী পরিমাণ ক্ষতি করেছিল দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাস তার এক মোক্ষম প্রমাণ।

মানিক অবশ্য বইয়ের ভূমিকায় বইটিকে গল্পও বলেননি উপন্যাসও বলেননি, বলেছেন. রূপক কাহিনী। কিসে যে রূপক কাহিনী হলো ঠিক বোঝা গেল না। লেখক একটা কথা বললেই যে সেটা গ্রাহ্য বলে মেনে নিতে হবে এমন নাও হতে পারে। মানিক অবশ্য 'রূপক কাহিনী' কথাটাকে তার পরেই সর্তাধীন করেছেন এই বলে যে, "রূপকের এ একটি নতুন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতকগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায় সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection—মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।"

লেখক মনে করলেই সে কথা সব সময় মনে করা যায় না। পাঠকের একটা নিজস্ব মূল্যায়ন আছে। তবে হাঁ, "চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়…মানুষের এক

এক টুকরো মানসিক অংশ”—মানিকের এই কথা যথার্থ বটে। কেন না মানুষকে মানুষ না ভেবে কতকগুলি অদ্ভুত চিন্তার পুঁটুলি হিসাবে ভাবায় মানিক সিদ্ধশিল্পী ছিলেন। মানুষের কিম্ভূত মনস্তত্ত্বের রূপায়ণে তাঁর জুড়ি ছিল না। অন্ততঃ তাঁর প্রথম দিক্‌কার লেখা সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

পুতুলনাচের ইতিকথা

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের তুলনায় পুতুলনাচের ইতিকথা অনেক, অনেক বেশী শক্তিশালী উপন্যাস। কি গঠন পরিকল্পনায় কি চরিত্র রূপায়ণে। চরিত্রগুলির উপস্থাপনাও অনেক বেশী শিল্পসম্মত। ফ্রয়েডবাদের প্রভাবের দুঃখজনক ফলশ্রুতি হিসাবে এ বইতেও যৌনতার চিত্রণ আছে, তবে সে চিত্রণ রীতিমত সংযত, যৌন আকর্ষণের আকাট বর্ণনার মধ্যে না গিয়ে—যা একাধিক লেখক আজকাল করে থাকেন—মানিক এ বইতে প্রধানতঃ ইঙ্গিত আর সংকেতের সাহায্যেই সে কাজ সেরেছেন।

তবে এ বইও মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাববাদের ঘরানায় লালিত। মানিকের পরবর্তীকালীন উপন্যাসগুলির মত এ বইতে সমষ্টিচেতনার কোন ছাপ নেই—সামূহিকতা এ উপন্যাসের পরিকল্পনায় অনুপস্থিত। ব্যক্তিসত্তার নির্জ্ঞান চেতনার স্তরে কামনা-বাসনার যে দুর্জ্ঞেয় আলোছায়ার খেলা চলে তার চমৎকার শিল্পরূপ এই উপন্যাস।

তবু এ উপন্যাসের একান্ত অ-গণমুখী ছাঁচটি ভোলা চলে না। সমাজচৈতন্যে এ উপন্যাস দীপ্ত নয়। তার উপর এক ধরনের নিয়তিবাদ—অদৃষ্টের দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাবের কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণের ভাবটি উপন্যাসটিকে ভারতীয় সনাতন ভাববাদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। এ বইতে ইচ্ছাশক্তির কোন দাম দেওয়া হয়নি, মানুষ মাত্রেই ভবিতব্যের হাতের সুতোয় টানা পুতুল—এই ভাবটির উপরেই জোর পড়েছে বেশী। উপন্যাসটির শেষে আছে—“নদীর মত নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিত। মাধ্যাকর্ষণের মত যা চিরন্তন অপরিবর্তনীয়।” এমনতর মনোভাব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়ক নয়, উল্টো, মানুষের নিরুপায়তাকেই জোরালো করে। সংগ্রামী ভাবের পক্ষে এ ক্ষতিকারক।

বর্তমান গ্রন্থের অন্যত্র এই বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করা হয়েছে, সুতরাং এখানে আর তাকে বিশদ করা হলো না।

পুতুলনাচের ইতিকথা এক গ্রাম্য ডাক্তারের কাহিনী। গাঁওদিয়া গ্রামের এক সম্পত্তি কেনাবেচা ও সুদের কারবারী সম্পন্ন গৃহস্থ গোপাল দাসের ছেলে শশী। শশী বাপের ইচ্ছায় কলকাতা মেডিকাল কলেজে ডাক্তারী পড়তে গেল। কলকাতায় যাবার আগে শশীর মন ছিল নিতান্ত গেঁয়ো, কিন্তু কলকাতায় বন্ধুজনদের সংস্পর্শে ও বইয়ের প্রভাবে তার এতাবৎ কুলুপ-আঁটা মনের অনেকগুলি দরজা-জানালা খুলে গেল। সে বহির্বিশ্বের উদার-মুক্ত ভাবধারা সম্বন্ধে সচেতন হলো। কলেজের সহপাঠী কুমুদ ছিল শশীর এই নবজন্মান্তরলাভের প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় সহায়। কুমুদের প্রভাবে চোখের-আঁধি-ঘুচে যাওয়া শশীর সংকল্প এখন থেকে সে বড় মাপে জীবনকে গড়ে তুলবে, গ্রামজীবনের সংকীর্ণতায় আর ফিরে যাওয়া নয়।

কিন্তু ডাক্তারী পাশ করে শশীকে গাঁয়ে এসেই বসতে হলো। বাপের ইচ্ছাও তা-ই। বাপের ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার চক্র মিলে শশীকে গ্রামেই স্থিতি করালে। শশী তার আধুনিক ভাবনা-চিন্তায় কর্ষিত মনকে গ্রামজীবনের সঙ্গে যথাসাধ্য মানিয়ে নিয়ে গ্রামবাসীর সেবা করতে লাগলো। মাঝে মাঝে তার মন বিদ্রোহ করে কিন্তু গ্রামের অসহায় রোগজীর্ণ মানুষগুলির কথা চিন্তা করে পরক্ষণেই তার বিদ্রোহ মিইয়ে আসে। হাজার হোক, সে তো গাঁয়েরই সন্তান বটে। এদের সে না দেখলে কে দেখবে? শশীর উদার শিক্ষিত মহানুভব সত্তায় এতকালের দেখা গ্রাম একটি অজানা আয়তন ও অদেখা মাত্রা নিয়ে দেখা দিল। ওই এঁদো বদ্ধ-ডোবা অজ-পাড়াগাঁকেই সে ভালবাসতে শিখল।

বজ্রাঘাতে মৃত হারু ঘোষের পুত্র পরান, কন্যা মতি। পরানের বৌ কুসুম। এই বাড়ীতে শশীর আবাল্য যাতায়াত। এখন ডাক্তারীর সূত্রে আরও ঘন-ঘন যাওয়া-আসা। কুসুম গাঁয়ের বধূদের মধ্যে সব দিক থেকেই একটু আলাদা ধরনের—একটু বুঝি ছিটগ্রস্ত। বাপ-মায়ের অতিরিক্ত আদরে ছোটবেলা থেকেই একটু আবদেরে স্বভাবের। ভাল ঘর বর দেখে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কুসুমের সন্তান হয়নি—বন্ধ্যা নারীর শূন্যতা তার ছিটগ্রস্ত স্বভাবকে আরও হেঁয়ালিময় করে তোলে।

ননদিনী মতির প্রতি কুসুমের গভীর সৌখ্যও আছে আবার ঈর্ষাও আছে। ডাক্তারী করার সূত্রে শশী প্রায়ই ওদের বাড়ী যায়। বস্তুতঃ ছোটবেলা থেকেই এই বাড়ীতে শশীর স্বাভাবিক যাতায়াত, সেটা এখন চিকিৎসার সুবাদে আরও বেড়েছে। কুসুমের ধারণা শশী মতির প্রতি একটু বেশী মনোযোগপরায়ণ, কুসুমের কমবেশী স্থুলাঙ্গিতার তুলনায় মতি দেখতে ছিমছাম সুন্দর বলে এই

বাবদেও কুসুমের ঈর্ষার কাতরতা। শশী অবশ্য চিকিৎসার সূত্রেই ওদের বাড়ী যায়, তার মনে প্রেম বিকারের কোন ভাব নেই কিন্তু কুসুম শশীর প্রতিটি চলাবলার মধ্যে বাঁকা মানে খোঁজে। মতির অসুখ সারানোর চেষ্টাটাও যেন শশীর পক্ষে একটা অপরাধ। মতির সঙ্গে টেক্কা দেবার জন্যে সেও মিথ্যে মিথ্যে করে অসুখের ভান করে এবং অষুধ আনবার অছিলায় শশীর বাড়ী গিয়ে মতির বিরুদ্ধে শশীর কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বানিয়ে বলে। আবার শশীর বিরুদ্ধেও সুযোগ পেলে মতির কানভারী করতে ভোলে না।

মোট কথা, কুসুম একটি দুর্জ্ঞেয় চরিত্র। তার যাবতীয় চলা বলা ভাবনা চিন্তা মনস্তত্ত্বের স্তরে, তাইতে তার স্বভাবের মধ্যে স্বতই একটা হেঁয়ালিপনা এসে গিয়েছে। সরল-অন্তঃকরণ ভালমানুষ স্বামী পরানের আটপৌরে মামুলী জীবন কুসুমের দুর্জ্ঞেয় স্বভাবের কিনারায় আরও একটি মাত্রা যোগ করেছে। স্বামীর প্রতি তার অন্তরে যথেষ্ট মমত্ব আছে, সে বিশ্বাসহীনা কিংবা স্বামীর সেবাযত্নে উদাসীনা নয়, তাই বলে স্বীয় স্বভাবের অন্তর্নিহিত ঝোঁক অনুযায়ী চলতে সে কোন শাসন-বারণকেই আমল দিতে প্রস্তুত নয়। ধনী বাপ মায়ের আদুরে কন্যার এই আহ্লাদী ভাবটি বিয়ের পরেও তার স্বভাবে লেপ্টে রয়েছে।

মতির সঙ্গে শশীর বিয়ে হলে বেশ হয় এই রকমের একটা কানাঘুষা বোধ করি দুই পরিবারের আবহাওয়ায় প্রশ্রয় পেয়ে চলেছিল, হয়ত শশীর মনেও এ বাবদে কিছু রঙ ধরে থাকবে কিন্তু একটি ঘটনায় সব কিছু পাল্টে গেল। গ্রামে এল এক যাত্রাপার্টি কয়েক রাত অভিনয়ের বায়না নিয়ে আর সেই দলে কিনা হীরোর ভূমিকায় কুমুদের আবির্ভাব—যে-কুমুদ একদা শশীর মেডিকেল কলেজ জীবনের সহপাঠী বন্ধু ছিল এবং শশীর মুগ্ধ চেতনার সামনে বহির্জগতের বহুতর স্বপ্নময় সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিল। কুমুদের এই পরিণতি! এক অযুতপ্রতিশ্রুতিময় আদর্শবাদী বিপ্লবী তরুণ থেকে নেমে এসে শেষ পর্যন্ত যাত্রার দলের নায়ক! শশী প্রাণে মস্ত বড় একটা ধাক্কা খেল আবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভেবে সান্ত্বনা পেল, এঁদো গাঁয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবদ্ধ থাকবার অসহায় নিয়তি একমাত্র তারই নয়, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী উজ্জ্বল যুবক কুমুদও আজ ঘটনার চক্রে তারই সমশ্রেণীতে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু মতি কুমুদের অভিনয় দেখে একেবারে মজে গেল। যতদিন যাত্রার দল গাঁয়ে ছিল, কুমুদের অভিনয় দেখে দেখে তার আশ আর মেটে না। কুমুদও এই মেয়েটির গ্রাম্য সৌন্দর্যে ও সরলতায় মুগ্ধ হলো। ফাঁক পেলেই পরানদের বাড়ী যায় ও পরানের বোন মতির সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে।

তারপর যা হবার তাই হয়। কুমুদ মতিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে এবং আরেক যাত্রায় গ্রামে এসে মতিকে সত্যি সত্যি বিয়ে করে নিয়ে শহরে চলে যায়।

শশীর এই বিয়েতে তেমন সায় ছিল না। স্বভাব-চঞ্চল যুবক কুমুদের গ্রাম্য বালিকার প্রতি নেশা জুড়িয়ে যেতে কতক্ষণ। তার ওপর মতিই বা কুমুদের দুর্বার অস্থিরচিত্ততার সঙ্গে কতটা বা কতদিন নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে—এই রকমের সাতপাঁচ চিন্তা করে শশীর দ্বিধা ঘুচতে চাইছিল না। কিন্তু অনিবার্যকে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়? কুমুদকে বিয়ে করার জন্য মতির ক্ষ্যাপামির কাছে শশীকে শেষ অবধি হার স্বীকার করতেই হলো।

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে দুটি উপকাহিনী আছে—একটি মতি-কুমুদের কাহিনী। আর একটি বিন্দু-নন্দলালের কাহিনী। বিন্দু শশীর বোন। তার বিয়ে হয়েছিল নন্দলালের সঙ্গে। নন্দলাল কলকাতার এক ব্যবসায়ী বড় লোক। কিন্তু সে বিন্দুকে বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা না দিয়ে তাকে রক্ষিতার মত রেখেছিল—আলাদা বাড়ীতে আলাদা দাসদাসী ঠাকুর দারোয়ান সমেত। নন্দলালের অন্য সংসার ছিল এবং সেইটিই আসল সংসার—স্ত্রীপুত্র কন্যা আত্মীয় পরিজন নিয়ে জমজমাট এক পরিবার। অভিমানিনী বিন্দু তার এই অপমানকর অবস্থায় প্রথমে সতেজে প্রতিবাদ জানায় কিন্তু প্রতিবাদে কোন ফল না হওয়ায় শেষে ক্ষোভে আক্রোশে মরিয়া হয়ে মদ ধরে। যে-মদ একদা নন্দলালকে বিন্দুর অনিচ্ছুক ঠোঁটের ভিতর শাঁড়াশি চেপে জোর করে গলিয়ে দিতে হয়েছিল সেই মদ এখন বিন্দুর সর্বক্ষণের সাথী—সান্ত্বনার অবলম্বন।

বোনের এই হতদশায় শশী মর্মাহত। সে বোনকে নন্দলালের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে কলকাতা যায় এবং বোনকে গাঁওদিয়া ফিরিয়ে নিয়ে আসে। শশীর বাপ গোপাল কিন্তু শশীর এ কাজ সমর্থন করতে পারে না। সে বলে স্বামী যদি একটা খেয়াল পরিতৃপ্ত করবার জন্য তার স্ত্রীকে একটা আলাদা বাড়ীতে চাকর-দারোয়ানের হেপাজতে রাণীর হালে রাখে তাহলে তাদের কী বলবার থাকতে পারে? বিয়ে হয়ে গেলে মেয়ে পর হয়ে যায় সে-খেয়ালও কি শশীর নেই? কিন্তু শশীর ন্যায়নিষ্ঠ মন বাপের এই কুযুক্তি মানে না। সে বিন্দুকে কলকাতা থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখে এবং তাকে শোধরাবার সুযোগ দেয়।

কিন্তু শোধরাতে চাইলেই কি শোধরানো যায়? বিন্দু কিছুদিন দাদার

শুভংকর প্রভাবে ভাল একটি মেয়ের মত চলবার চেষ্টা করে কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই হাঁফিয়ে ওঠে। তার মদের নেশা অদম্য হয়ে ওঠে। শেষে টিকতে না পেরে দাদার ডাক্তারখানা থেকে অষুধের জন্য রাখা অ্যালকোহল চুরি করে খায়। শশী হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। শশী বিন্দুকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে রেখে আসে।

এই উপন্যাসের এদুটি ছাড়াও আরও দুটি সাব-প্লট আছে। একটি যাদব পণ্ডিতের উপাখ্যান, অন্যটি যামিনী কবিরাজ-সেনদিদির কাহিনী। যাদব পণ্ডিত ও তাঁর স্ত্রী পাগলদিদির নির্দিষ্ট দিনে ইচ্ছামৃত্যু বরণের কাহিনীটি কৌতুহলোদ্দীপক, কিছুটা কৌতুককরও বটে। জনগণের কুসংস্কার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে কী সাংঘাতিক পরিণতি ডেকে আনতে পারে সস্ত্রীক যাদব পণ্ডিতের নাটকীয় মৃত্যুর ঘটনা সেই সত্যটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল।

যামিনী কবিরাজের স্ত্রী সেনদিদি এককালে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। বেশী বয়সে তাঁর এক ছেলে হতে গিয়ে তিনি মারা যান। সেনদিদিদের বাড়ীতে শশীর বাপ গোপালের কারণে-অকারণে যাতায়াত গ্রামবাসীদের মুখরোচক আলোচনার বিষয় ছিল। তারা এর মধ্যে কলঙ্কের গন্ধ পেত। কলঙ্ক ভিত্তিহীনও ছিল না। যে-পুত্রসন্তানটি প্রসব করতে গিয়ে সেনদিদি মারা গেলেন সেটি গোপালেরই ঔরসজাত বলে লোকের বদ্ধমূল বিশ্বাস। অবশ্য সেনদিদি কুলটা স্বভাবের নারী ছিলেন না। প্রকৃতি ছিল মধুর, স্নেহশীল, শান্ত। সকলকেই প্রাণ ভরে ভালবাসতেন। বিশেষতঃ শশীর প্রতি ছিল তাঁর অপরিমিত স্নেহ। যদি তাঁর পদস্খলন হয়েও থাকে সে গোপালের জবরদস্তিতে, তার নাছোড়বান্দা লোলুপতার কারণে। শশী এই বাবদে তার বাপকে কোন সময়েই ক্ষমা করতে পারেনি।

যাই হোক, উপন্যাসের আসল উপজীব্য কিন্তু শশী-কুসুমের সম্পর্ক। আগাগোড়াই মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক তাতে দেহবাসনার ছিটে লেগেছে কিন্তু কোথাও মনকে আড়াল করে দেহ সামনে এসে দাঁড়াতে পারেনি। এক জায়গায় কুসুম শশীকে বলছে—"আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু।" ব্যস, ওই পর্যন্তই। এর বেশী কোথাও শরীরের ভূমিকা নেই।

এই জন্যই উপন্যাসটিতে শশী-কুসুমের আপাত-ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে গ্রামে কোন কানাকানি নেই। পরানদের সংসারেও কারও সেটা চোখে পড়েনি।

আগাগোড়াই যে-সম্পর্ক মনের স্তরে বহমান তাই নিয়ে কথা উঠবে কী করে? পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে পল্লী আছে কিন্তু সমাজ নেই—অনেক সমালোচকের এই উক্তি এ বিচারে খুবই যথার্থ বলে মনে হয়।

একটি অনবদ্য উপন্যাস, হয়ত শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়ে মানিকের সর্বোৎকৃষ্ট রচনা, তবে পুরাপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যার রূপায়ণ। জনজীবন এতে অনুপস্থিত।

পদ্মানদীর মাঝি

পদ্মানদীর মাঝি-ই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস, যার মধ্যে জনজীবন উপস্থিত। পূর্ববঙ্গের পদ্মা তীরের জেলেদের নিয়ে এই উপন্যাসের কলেবর তৈরী। পদ্মা তীরের ধীবর সম্প্রদায় নিত্য অভাব-প্রপীড়িত নিত্য দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট। এরা এত হতদরিদ্র যে মাছ ধরার নৌকা তো পরের কথা, জাল কেনারও এদের পয়সা নেই, মহাজন কিংবা সম্পন্ন ভদ্রজনের কাছ থেকে বখরার আধাআধি ভাগের চুক্তিতে এগুলি তাদের সংগ্রহ করতে হয়। এদের একভাগ জেলেগিরি না করে মাঝিগিরি করে। পদ্মায় খেয়া নৌকা বায়। কিন্তু তাদের অবস্থাও কিছু ভিন্ন নয়। নিত্য অভাব-অনটন লেগেই আছে। অনশন-অর্ধাশনে দিন কাটে।

গ্রন্থের প্রারম্ভিক বর্ণনার একাংশ: "জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কনকন। আসে রোগ, আসে শোক, টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষন্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"

কুবের এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র—অতিশয় দরিদ্র এক মাছ মারা জেলে। পদ্মায় সারারাত নৌকো বেয়ে ইলিশ মাছ ধরা ওর কাজ। কিন্তু প্রচুর মাছ জালে ধরা পড়লেও তার থেকে লাভ বিশেষ কিছুই পায় না। চাষীর

ফসলের বেশীর ভাগই যেমন জমিদার জোতদার আর মহাজনের গর্ভে যায় তেমনি ইলিশ মাছের ফসলেরও অনেকটাই একই পথ বেয়ে ধনার উদরপূর্তির সহায়তা করে। ধীবরের অবস্থা যে-কে-সেই। কুবেরের দারিদ্র্য দশা আর ঘুচতে চায় না। ঘরে স্ত্রী মালা আর অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা। ক্ষুধার জ্বালায় বাচ্চাদের ট্যা-ফোঁ লেগেই আছে। মালা রোগজীর্ণা, তার উপর খোঁড়া। নিত্য অভাবের তাড়নায় তার মেজাজ খিটখিটে। এদিকে বছরের এমাথা-ওমাথা তার আঁতুর হওয়া বাঁধা। জেলেদের জীবনে আমোদ-প্রমোদের সুযোগ কিংবা আনন্দের অভাবে দুটি ব্যসনের প্রাধান্য—তাড়ির নেশা আর কাম। নেশায় দুঃখ-জালার সাময়িক বিস্মরণ, আর দাম্পত্য কাম প্রবৃত্তির অভ্যাসগত যান্ত্রিক চর্চায় আনন্দ অন্বেষণের বৃথা প্রয়াস।

শুধু কুবেরই নয়, গোটা জেলেপাড়ার জীবনই এই ছাঁচে বাঁধা। কুবের, গণেশ, রাসু, সিধু, আমিনুদ্দিন, জহর সব জেলেরই জীবনযাত্রার ছকটি কম-বেশী এক। নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে জেলেদের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের লোকই আছে কিন্তু ধর্ম এদের জীবনের ধারাধরনে বিশেষ কোন প্রভেদ আনে না। গ্রন্থকারের নিজের ভাষায়—"ধর্ম যতই পৃথক হোক দিন-যাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক অধর্ম পালন করে—দারিদ্র্য। বিবাদ যদি কখনও বাধে সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অল্পেই।"

জেলেদের জীবন সম্বৎসর অল্পবিস্তর একলয়ে বয়ে যায়। ছন্দোবৈচিত্র্য একেবারেই নেই তাদের জীবনের ধারায়। পদ্মা নদী অতিশয় উত্তাল, কিন্তু পদ্মার ঢেউয়ের সঙ্গে নিরত ঘর করেও এদের জীবন নিস্তরঙ্গ, স্রোতোহীন। প্রচণ্ড দারিদ্র্য এদের জীবন থেকে সমস্ত প্রকার স্রোতোবেগ শুষে নিয়েছে। রাখার মধ্যে রেখে গেছে কতকগুলি পঙ্কিল আবর্তের ক্লেদ। নিতান্ত স্থূল রসিকতায় মাতা, পারিবারিক কেলেঙ্কারির ঘটনা নিয়ে কদর্য কানাকানির চর্চা, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ—এইসব অসার ব্যায়ামের মধ্য দিয়েই এদের দৈনন্দিন দিনযাত্রার অবসরের মুহূর্তগুলি কাটে। বর্ণহীন একঘেয়েমির চূড়ান্ত।

ঠিক এমনি বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে কেতুপুর গ্রামে এল হোসেন মিয়া নামে এক বর্ণাঢ্য চরিত্রের মানুষ। গোড়ার দিকে সে ছিল নিঃস্ব অবস্থার লোক কিন্তু আপন বুদ্ধিবলে ও নানা যোগাযোগের চক্রে সে অল্পদিনের মধ্যেই তার অবস্থা ফিরিয়ে ফেললে। এখন সে রীতিমত একজন সম্পন্ন ব্যক্তি—জমিজিরেত আর ব্যবসাবাণিজ্যের টাকাকড়িতে খুবই জমজমাট তার দোকান।

কিন্তু অবস্থাপন্ন হলেও নিরহঙ্কার তার স্বভাব—সকলের সঙ্গে সে সমানভাবে মেশে, এমনকি অতি হতদরিদ্র জেলের খোঁজ-খবর করতেও সে ভোলে না। সকলের বাড়ীতেই তার সমান গতিবিধি, কেউ তার অনাত্মীয় নয়। জেলেদের শতচ্ছিন্ন হতশ্রী ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক টানতে টানতে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে তাদের সুখ-দুঃখের বার্তা-বিনিময় করে। জেলেদের আপদে-বিপদে টাকা ধার দেয়। ধার শোধের জন্য তাগাদা করে না।

মোটকথা, অদ্ভুত রহস্যময় এক মানুষ—এই হোসেন মিয়া। তার যে কোনরূপ বদ্ মতলব আছে তা-ও নয়। জেলেদের পরিবারগুলিতে যার এমন অবাধ যাতায়াত, তার সম্পর্কে মেয়েঘটিত কোন কেচ্ছা পল্লবিত হয়ে উঠতে কেউ কখনও শোনেনি। আসলে ও পথের পথিকই সে নয়। তবে সে কী? জেলেদের সঙ্গে তার এমনতর ঘনিষ্ঠতার কারণ কী? ঘনিষ্ঠতার কারণ একটাই—সে একজন ছোটখাট অ্যাডভেঞ্চারার, স্বপ্নদর্শী তার মন, কেতুপুরের অর্ধ-উলঙ্গ আকাট-গরিব মানুষগুলিকে দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত করে তাদের জীবনে স্বস্তি-সুখের হাওয়া বইয়ে দিতে সে উদ্‌গ্রীব। আর সেজন্য তার একটি পরিকল্পনা তৈরীও আছে। যে-নোয়াখালি জেলায় তার আদিবাড়ী সেই জেলার অদূরস্থিত সমুদ্রদ্বীপ ময়নায় (সন্দীপ নয় তো?) সে জেলেদের নিয়ে একটি উপনিবেশ গড়ে তুলতে চায়। সেই উপনিবেশে গিয়ে ঘর বাঁধলে জেলেদের দারিদ্র্যদশা আর থাকবে না। তাদের সংসার শ্রী-সম্পদে ভরে উঠবে। হোসেন মিয়া হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতির ভিত্তিতে ময়নাদ্বীপের উপনিবেশটিকে যথার্থ অসাম্প্রদায়িক আকার দিতে আগ্রহী, সেই কারণে ময়নাদ্বীপে মোল্লা-পুরুত উভয়েরই উপস্থিতি তার অনভিপ্রেত। সে সেখানে মন্দিরও বানাতে চায় না, মসজিদও গড়ে তুলতে অনিচ্ছুক। কী উদার অসাম্প্রদায়িক আধুনিক মনের অভিব্যক্তি।

এইখানে সমালোচনাচ্ছলে একটা কথা বলি। সমালোচকদের মধ্যে একাধিক জন হোসেন মিয়াকে একটি অপূর্ব চরিত্র বলে বর্ণনা করেছেন—তার আদর্শবাদী স্বপ্নিল মনের গড়নের শতমুখে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমার কাছে হোসেন মিয়া একটি নিতান্ত অবাস্তব চরিত্র বলে মনে হয়েছে এবং মানিকের লেখনীর পক্ষে বেমানান বলেই বোধ হয়েছে। হোসেন মিয়ার উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতা, নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষ জনদের প্রতি দরদ অপূর্বতার লক্ষণ মণ্ডিত হতে পারে কিন্তু মানিক যখন এই বই লিখেছেন তখনকার পূর্ববাংলার গ্রামীণ-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে

এমনতর চরিত্রের আবির্ভাবের কল্পনা শুধু অসম্ভব নয়, অলীক। এই অবিশ্বাস্য চরিত্রটির সংযোজনায় মানিকের অন্যথা উৎকৃষ্ট উপন্যাস পদ্মানদীর মাঝি-র বাস্তবতার সমূহ ক্ষতি হয়েছে। যদি বলা হয় চরিত্রটি মানিকের লেখক-ব্যক্তিত্বের মানসিক এক প্রক্ষেপ, সেক্ষেত্রে বলব এই প্রক্ষেপণের আদৌ কোন আবশ্যকতা ছিল না। উপন্যাসের কাহিনী যদি নিজের গতিবেগের জোরে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে না পারে সেক্ষেত্রে লেখকের আদলে চরিত্র সৃষ্টি করে কি সে-কাজ সম্পন্ন করা যায়? না, সেটা করা উচিত?

আসলে মানিক যে তখনও পর্যন্ত তাঁর পায়ের তলায় বাস্তবতার দৃঢ় মাটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না, ওই মাটির জন্য পথ হাঁকড়াচ্ছিলেন—এ তারই প্রমাণ। পদ্মানদীর মাঝি বাস্তবতা ও অবাস্তবতার এক অদ্ভুত মিশাল। মার্কসবাদী প্রত্যয়ের দৃঢ়ভিত্তি মানিক তখনও আশ্রয় করতে পারেননি। ওই দৃঢ়ভিত্তির আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর লেখায় এমনতর দোলাচলচিত্ততা, বিমিশ্র মনোভাব লেগেই ছিল। আমরা সহরতলী উপন্যাসেই প্রথম এই দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতার অবসান প্রত্যক্ষ করলাম।

যাই হোক, কাহিনীর সূতোয় আবার ফিরে আসি। কুবেরের শ্যালিকা কপিলা এই উপন্যাসের একটি আকর্ষণীয় চরিত্র। কপিলা বিবাহিতা কিন্তু স্বামী শ্যামাদাসের সঙ্গে কলহ করে কপিলা বাপের বাড়ী চলে আসে, আর স্বামীর ঘর করতে যায় না। শ্যামাদাস আরেকটি বিয়ে করে নতুন সংসার পাতে। কুবেরের শ্বশুরবাড়ী চরভাঙ্গা একবার বন্যার জলে তলিয়ে গেল। কুবের মালায় বন্যাকবলিত ভাইবোনদের জল সরে না যাওয়া তক্ দিন কতক নিজের বাড়ীতে এনে রাখল। তাদের মধ্যে কপিলাও ছিল। কপিলার উচ্ছলতা, রঙ্গরস, ভরন্ত যৌবন কুবেরের মনে রঙ্ ধরায়। কুবেরের মেয়ে গোপীর পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাকে দেখাবার জন্য কুবেরকে আমিনবাড়ীর হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। সঙ্গে কপিলাও যায়। সে-রাত্রি তাদের আর ফিরে আসা হয় না। কপিলাকে ঘিরে কুবেরের মনে এক অতৃপ্ত সাধের রহস্য-কুহেলির জগৎ গড়ে ওঠে। কিন্তু কুবেরের এই রঙীন স্বপ্ন-কামনা ক্ষণস্থায়ী হয়। কেননা শীঘ্রই শ্যামাদাস এসে কপিলাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে শ্যামাদাসের বৌ মারা গিয়েছিল, তাই আবার কপিলার ডাক পড়লো।

পরের ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত কিন্তু কাহিনীর দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গোপীর বিয়ে উপলক্ষ্যে কপিলা দিদি-জামাইবাবুর বাড়ী বেড়াতে এসেছে। দিদি তো চিররুগ্না, তাই কপিলাই বিয়ের সব কাজকর্ম একহাতে করে। সে একাই

একশো। কুবের কপিলার কর্মক্ষমতা দেখে অবাক্ হয়। ইতোমধ্যে কুবের হোসেনের চালানী নৌকায় ঠিকা মাঝির কাজ নিয়েছিল। পরিবারের সবকটি প্রাণীর উদরপূর্তির প্রয়োজনে তার এই পথ অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মাছ মারার আয়ে সংসার চলে না, অথচ সংসারটিকে তো টিকিয়ে রাখতে হবে।

কুবের-রাসু-গণেশ-জহরদের কাছে ময়নাদ্বীপে গিয়ে উপনিবেশ গড়ার প্রস্তাবে হোসেন মিয়া একদিনের জন্যও ঢিল দেয়নি। সে তাদের তৃষিত চক্ষুর সামনে ময়নাদ্বীপের মরীচিকা সদা-উদ্যত করেই রেখেছিল। হোসেন মিয়ার হাতছানিতে ভুলে রাসু একদফা ময়নাদ্বীপে গিয়েছিল কিন্তু স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে এসেছে। তবু কুবেরের চোখে ময়নাদ্বীপের আকর্ষণ ফিকে হয়ে যায়নি। উপনিবেশের নয়া পরিবেশে নতুন করে ঘর বাঁধার মধ্যে এতদিনের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের নিরুপায় নিগড় থেকে চিরকালীন মুক্তির সম্ভাবনা তার কল্পনাকে বারে বারেই উদ্দীপিত করে তুলছিল তখনও পর্যন্ত। সেই সঙ্গে যৌনমুক্তির সম্ভাবনাও কি কুবেরের কল্পনাকে উত্তেজিত করেনি?

উপন্যাসের শেষে পাই, ময়নাদ্বীপে যাবার মানসে কুবের কপিলার হাত ধরে নৌকাঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পিছনে পড়ে রইল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, পরিচিত পরিবেশ, কেতুপুরের অভ্যস্ত জীবন। এক অজানার—অদেখার ইঙ্গিতে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

নৌকার মাঝিদের নিয়ে বাংলায় এই প্রথম সার্থক উপন্যাস। তারপর আরও কেউ কেউ এ বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন—যেমন, অদ্বৈত মল্লবর্মণ (তিতাস একটি নদীর নাম), সমরেশ বসু (গঙ্গা), আবদুল জব্বার (ইলিশমারীর চর), প্রভৃতি। পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও জীবন্ত রচনা তিতাস একটি নদীর নাম। বিদেশেও এই জাতীয় উপন্যাসের নজীর আছে। যেমন, ইতালীয় লেখক জিওভান্নী ভারগার দি হাউস বাই দি মেডলার ট্রি। সুপরিচিত লেখক ভবানী মুখোপাধ্যায় আজ থেকে সাতাশ বছর আগে 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার এক প্রবন্ধে এই বিদেশী উপন্যাসটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

উত্তরপর্বের ছোটগল্প

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রিয়ালিস্ট লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের রচনা আর উত্তর পর্বের রচনার মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য আছে। বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পগুলির বেলায় এ পার্থক্য আরও বেশী প্রকট হয়ে চোখে পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের প্রথম পর্ব বলতে আমরা বুঝি ১৯২৮ সাল (যে বৎসরে তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'অতসীমামী' প্রকাশিত হয়) থেকে ১৯৪৩-৪৪ সাল এই কম বেশী পনেরো-ষোল বছরের রচনাকাল আর উত্তর পর্ব বলতে বোঝায় ১৯৪৩-৪৪ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৬ পর্যন্ত তাঁর জীবনের শেষ বারো-তেরো বছর কাল। এই দুই পর্বের রচনার ধারার মধ্যে শুধু বিষয়গত পার্থক্যই নয়, দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যও অতিশয় স্পষ্ট। উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই যেন এ পার্থক্য অধিকতর সোচ্চার।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার বেলায় এমনতর পর্ববিভাজনের কারণ কী? কারণ এই যে, দুটি সুস্পষ্ট পৃথক মনোভঙ্গী, পৃথক শুধু নয় বিপরীত মনোভঙ্গী, তাঁর এই দুই পর্বের রচনা রীতির মূলে সক্রিয় থেকে তাদের এক থেকে অন্যটিকে বিশ্লিষ্ট করে দিয়েছিল। (প্রথম পর্বের ছোটগল্পে তিনি ছিলেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অন্তর্নিবেশী, আত্মরতিমূলক বিশ্লেষণের পক্ষপাতী, জটিল ও মর্বিড; আর শেষ পর্বের রচনায় তিনি হয়েছিলেন বহির্মুখ, সামূহিক চেতনায় দীপ্ত, সহজ ও অজটিল রচনা রীতির পক্ষপাতী, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের শিল্পী।) প্রথম বয়সের লেখায় বর্ণিত চরিত্রগুলির মনোজীবনকে কেন্দ্র করে তাদের অসুস্থ কামনা বাসনা ও নির্জ্ঞান মনের কারিকরিকে জটিল রীতিতে রূপ দেওয়াই ছিল তাঁর কথাশিল্পের লক্ষ্য; আর শেষ বয়সের রচনায় তিনি ক্রমশঃ অন্তর্নিবেশ তথা নির্জ্ঞান নিরীক্ষণের অভ্যাস ত্যাগ করে মনুষ্য জীবনের বাইরের কর্মকাণ্ডকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ঐসব কর্মকাণ্ডকেও আবার ব্যক্তির একক জীবনের স্তরে রূপ দেননি, রূপ দিয়েছেন সামূহিক স্তরে অর্থাৎ সমষ্টি জীবনের সীমায়।

কোন একজন বিশিষ্ট সমালোচক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী মনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন তা ছিল "জটিল ও কুটিল"। এই বিশ্লেষণ মানিকের প্রথম জীবনের লেখা সম্পর্কে সর্বাংশেই প্রযোজ্য বলা যায় কিন্তু জীবনের রচনার ধারা সম্পর্কে বলা যায় কিনা সন্দেহ। কেননা এই অত্যন্ত সচেতনভাবে কুটিল মননের অভ্যাস পরিহার করবার চেষ্টা

বিয়ে উপলক্ষে
চিরকুগ্না, তাই

করেছিলেন, তার জায়গায় সোজা সরল ঋজুরেখ এমনকি চাঁচাছোলা রচনা-রীতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। ব্যক্তির নির্জ্জন মনের অন্ধকারে সাঁতার কেটে তিনি আর আগের মত তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না, বারে বারে তাঁর কল্পনা বাইরের রৌদ্রালোকে ভেসে উঠতে চেয়েছে এই অধ্যায়ে, আর সেই রৌদ্রালোকও কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনের সীমানায় সীমিত নয়, গণজীবনের সুপ্রশস্ত পরিসরে বিস্তৃত। যে-গণজীবন তিনি তাঁর শেষ পর্বের গল্পোপন্যাসে চিত্রিত করেছেন তা কিন্তু শোষক ও বঞ্চকের সকল অত্যাচার মুখ বুজে সওয়া নির্বিরোধ গণজীবন নয়, পক্ষান্তরে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রত্যাঘাতে সমুজ্জ্বল গণজীবন।

এ দেশের সাধারণ মানুষ বলীর দর্পের কাছে বিনা আপত্তিতে মাথা নোয়ানোকেই তাদের নিয়তি বলে জানে, অত্যাচারীর প্রবল পরাক্রমের মুখে পড়ে পড়ে মার খাওয়াকেই তাদের অপরিবর্তনীয় ভবিতব্য বলে জ্ঞান করে। কিন্তু মানিক এদেশের খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষগুলির এই পুরাতন পরিচিত গতানুগতিক ছকটিকে একেবারে উল্টে দিয়েছেন তাঁর শেষ বয়সের গল্পগুলিতে। ব্যক্তিগত জীবনের স্তরে প্রতিকারবিহীন নিরুপায়তায় অযথা হা-হুতাশ না করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ক্ষমতাবানের কাছ থেকে দাবি আদায়ের চেষ্টা, অন্যায়ের প্রতিবাদ, আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত, নিজেদের ঐক্য শক্তিতে বিশ্বাস ও সংকল্পের দৃঢ়তা—এই সমস্ত বিভিন্ন লক্ষণে মানিকের শেষ বয়সের গল্পগুলি শুধু শিল্পকর্মই হয়ে ওঠেনি, সাধারণ মানুষের ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকারও একটা পথের হদিস হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এই পর্বের গল্পে শিল্প ও কর্মিষ্ঠতার এক চমৎকার সমন্বয় দেখতে পাব, যা তাঁর আগের লেখায় কম বেশী অনুপস্থিত ছিল।. মানিক এই পর্বের লেখায় শুধু সমস্যা উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি, সমস্যার সমাধানেরও পথ বাতলে দিয়েছেন। এটা তাঁর সাহিত্যে সম্পূর্ণ একটা নয়া সংযোজন—নয়া আয়তন।

এ কথা অবশ্য সত্য যে মানিক তাঁর জটিল মননের সংস্কার এই পর্বেও পুরাপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তিনি চেষ্টা করেছেন সহজ সরল হতে কিন্তু তাঁর মজ্জাগত স্বভাব-জটিলতা এই অধ্যায়েও কোন কোন গল্পে তাঁকে চিন্তার জটে অস্বচ্ছ করে রেখেছে। যেমন তাঁর দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত 'কে বাঁচায় কে বাঁচে', 'সাড়ে সাত সের চাল', কিংবা 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্প তিনটিতে ভাগ্যাহত সাধারণ মানুষের অনশন ও ক্ষুৎপিপাসার বেদনা চমৎকার শিল্পরূপ লাভ করলেও

মানিকের স্বভাবসিদ্ধ জটিল ও কুটিল মননের পশ্চাৎটানের প্রভাব এখানেও দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু এমন কোন কোন গল্প আছে যেখানে তিনি এই জটিলতা-কুটিলতার পেছুটান পুরাপুরি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছেন। যেমন 'পেট-ব্যথা', মাসি-পিসি', 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'শিল্পী'. 'আর না কান্না', 'টিচার' প্রভৃতি গল্প। এসব রচনায় মানিক আত্মখণ্ডন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার অন্ধকার গহন থেকে নিজেকে মোচন করে তিনি এখানে পুরাপুরি মাত্রায় ঘটনাশ্রয়ী হয়ে উঠেছেন, হয়ে উঠেছেন বহির্মুখ, বস্তুনিষ্ঠ, অ্যাকশনধর্মী। চিন্তা থেকে কাজের জগতে উত্তরিত হয়েছেন। অযথা চিন্তা, অকারণ চিন্তা, এক কথায় চিন্তার আতিশয্য যে কোন কোন লেখকের রচনায় কখনও কখনও অসুস্থ মনোবিকারের কোঠায় গিয়ে পড়ে সেটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বয়সের একাধিক গল্পোপন্যাসের ছাঁচ থেকে প্রমাণ করা যায়। এ কথার উদাহরণ স্বরূপে আমরা তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের হেরম্ব চরিত্র, 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের শশী চরিত্র, 'প্রাগৈতিহাসিক', 'টিকটিকি', 'সরীসৃপ', 'কুষ্ঠরোগীর বউ' প্রভৃতি গল্পের বিষয়-বস্তু ও চরিত্রায়ণের উল্লেখ করতে পারি। মনোবিকলন অর্থাৎ মানুষের মনোবিকারের চিকিৎসক সুলভ ব্যবচ্ছেদী বিশ্লেষণে মানিকের এক অদ্ভুত উল্লাস ছিল, যার অসুস্থ প্রভাব তিনি ক্রমে ক্রমে কাটিয়ে উঠে এক সময়ে সুস্থতার জগতে পদার্পণ করেছিলেন। প্রথম যুগে রচিত 'বৌ' পর্যায়ের গল্পগুলিতে কিংবা সরীসৃপ কিংবা টিকটিকি গল্পতে তিনি যে মর্বিড মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন শেষের যুগের লেখা মাসি পিসি কিংবা হারানের নাতজামাই কিংবা পেটব্যথা গল্পে তাঁর ছিটেফোঁটা অবশেষও আর নেই। কেমন করে মানিকের শিল্পী জীবনে এই অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হলো সেটা একটা বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়।

পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করতে বসে প্রথমে যে কথাটা মনে উদয় হয় তা হলো মানিক তার কম বেশী সিকি শতাব্দী কাল স্থায়ী সাহিত্য জীবনে দুটি দৃষ্টিগ্রাহ্য আদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের আদর্শের দ্বারা; উত্তর জীবনে মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা। মানিক যে পরিমাণে ফ্রয়েডীয় ব্যক্তিতন্ত্র ও আত্মকেন্দ্রিকতার অভ্যাস থেকে দূরে সরে গিয়ে মার্কসীয় চৈতন্যের ভাববৃত্তের মধ্যে আপনাকে ধরা দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই তাঁর লেখা ক্রমসুস্থ, ক্রমবহির্মুখী, ক্রমসমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছে। তাঁর আত্মরতির মারাত্মক স্বভাব কেটে গেছে, দেখা দিয়েছে তাঁর মধ্যে

উত্তরোত্তর মাত্রায় সমষ্টিচেতনা, ঘটনাজীবিতা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আবেগ। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে যত বেশী সজাগ হয়েছেন তত তাঁর কলম ধারালো হয়ে উঠেছে, কলমের মুখে জেগে উঠেছে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের আকৃতি। কোথাও কোথাও এই আকৃতি বিদ্রোহের সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে।

যেমন মাসি-পিসি, হারানের নাতজামাই, পেটব্যথা প্রভৃতি গল্পে। আমরা যদি সরীসৃপ আর টিকটিকি গল্পের জগৎ থেকে ওই তিন পূর্বোক্ত নামীয় গল্পের জগতের অভিমুখে রওনা হই তবে দেখব পথ অত্যন্ত দীর্ঘ বিসর্পিত, তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত সাদা চোখে ঠাহর করা যায় না। দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তকে আলাদা করে রেখেছে। টিকটিকি গল্পে মর্বিডিটির চূড়ান্ত করে ছাড়া হয়েছে। সরীসৃপ গল্পে দুই মায়ের পেটের বোনের একের প্রতি অপরের যে উৎকট ঈর্ষা বিদ্বেষ ও সর্বনাশা জিঘাংসার পরিচয় মেলে তেমন ব্যাপার একমাত্র অসুস্থ মনোবিকারের জগতেই ঘটা সম্ভব। পক্ষান্তরে মাসি-পিসি, হারানের নাতজামাই কিংবা পেটব্যথা গল্পে এমনতর মনোবিকারের লেশমাত্র নেই, বরং আছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিত্র। এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এসেছে জনজীবনের সঙ্গে একাত্মতার সূত্রে। মনোবিকলন সর্বদাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও অন্তর্নিবেশমূলক ; পক্ষান্তরে বহির্মুখীনতা, ঝোঁকের তারতম্য অনুযায়ী, সর্বদাই সমষ্টিজীবনের সঙ্গে যুক্ত। যতদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক রীতির হাতে ধরা হয়ে চলেছিলেন ততদিন মানুষের সমষ্টিজীবনের সুখদুঃখ তাঁর চোখের আড়ালে ছিল ; এই পর্বে তিনি কেবলই, অন্তহীন পরিক্রমায়, নিজের ও অপরের নির্জ্ঞান ও অর্ধজ্ঞান মনের গভীরে দৃষ্টি সঞ্চালিত করে লোকের অসুস্থ মানসিকতার তত্ত্ব খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিলেন। নয়তো টিকটিকির মত গল্প লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। সেই মানিকই কিনা পরে লিখলেন জনসাধারণের প্রতিরোধমূলক একাধিক উৎকৃষ্ট ছোটগল্প। যখন থেকে তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে আত্মকেন্দ্রিকতার অবসান ঘটে সামূহিক চেতনার বিজয় ঘোষিত হলো তখন থেকেই তাঁর শিল্পদৃষ্টি প্রকৃত অর্থে খুলে গেল। এ যে কত বড় বিবর্তন তার আন্দাজ পাব যদি মনে রাখি যে ফ্রয়েড আর কার্ল মার্কস একে অন্যের থেকে দুই দূরতম প্রস্থান বিন্দু। দুইয়ের বিচরণ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে।

সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয় দর্শনের যুগ্ম পরিণাম ফল বলে মনে করেন। একথা ঠিক নয়। তাঁর সাহিত্য জীবনে ফ্রয়েড আর মার্কস দুইয়েরই প্রভাব স্বীকৃত, তবে এককালীন

নয়। এই দুইয়ের প্রভাব তাঁর জীবনে বর্তিয়েছিল পর্যায়ক্রমে—পরে পরে, সম সময়ে নয়। প্রথম বয়সে ফ্রয়েডীয় আত্মরতির মাত্রাহীন প্রভাব; পরে ফ্রয়েডের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে মার্কসীয় চিন্তা-চৈতন্য।/ অবশ্য কিছু কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্প রয়েছে যার মধ্যে এই দুই দৃষ্টিকোণেরই যুগপৎ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; যেমন দর্পণ, অহিংসা, চতুষ্কোণ প্রভৃতি উপন্যাস, ছোটগল্পের ভিতর কে বাঁচায় কে বাঁচে, হলুদ পোড়া, ছিনিয়ে খায়নি কেন প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। হলুদপোড়া গল্পে একটি গ্রাম্য কুসংস্কারকে (লোকের উপর ভূতের ভর হওয়া ও ওঝার চিকিৎসায় সেই ভূতঝাড়ানোর চেষ্টা) এক হাত নেওয়া হয়েছে কিন্তু ওই কুসংস্কারের এখনও যে কতখানি শক্তি বিদ্যমান তাও দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ তীক্ষ্ণ সমালোচনা সত্ত্বেও গল্পটির মধ্যে বাস্তববোধ বিলক্ষণ মাত্রায় বর্তমান, তেমনি বাস্তববোধ ছড়িয়ে আছে ছিনিয়ে খায়নি কেন গল্পে। দুর্ভিক্ষের বাজারে ব্যবসায়ীদের গুদামে ও দোকানে খাদ্য থরে থরে সাজানো থাকা সত্ত্বেও বুভুক্ষু অভাবগ্রস্ত মানুষেরা কেন খাদ্য লুঠ করে খায়নি তার একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই গল্পে। রচনাটিতে সমালোচনা আছে কিন্তু বিদ্রোহ নেই। বিদ্রোহের ধার ভোঁতা হয়ে গেছে যারা বিদ্রোহ করবে, খাদ্য লুঠ করে খাবে, তাদের নির্জীবতায়, প্রাণশক্তির অভাবে। দুঃশাসনীয় গল্পটিও একটি ব্যর্থতার গল্প। চমৎকার শিল্পরচনা কিন্তু ট্রাজেডির বেদনায় গল্পের রস স্বতই করুণ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় চাল চিনি কেরাসিনের মত বস্ত্রের সংকটও অতিশয় উৎকট হয়ে উঠেছিল। সেই বস্ত্রের সংকট এই গল্পের বিষয়বস্তু, গল্পের নাম থেকেই যার আন্দাজ পাওয়া যায়। গল্পের শেষটি এত ব্যথাময় যে বঞ্চক বস্ত্রচোরদের বিরুদ্ধে তীব্র রোষও চোখের জলে গলে যায়। রাবেয়ার জলে ডুবে আত্মহত্যা সমস্ত গল্পটির উপর একটা গভীর বিষাদের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। বস্ত্রের কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও আক্রোশ প্রকাশের কথাটা যেন মনে হতেই চায় না এমনি বিষাদের নিবিড়তা।

এখানে বলবার কথা এই যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন পর্যন্ত ফ্রয়েডবাদ আর মার্কসবাদ-এর সীমান্ত-রেখায় দুলছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁর লেখায় প্রতিবাদ আর প্রত্যাঘাতের চেতনা তরবারির শাণিত ধারের মত ঝলসিত হয়ে ওঠেনি, শ্রেণী সংঘর্ষের তত্ত্বকে তখনও তিনি সার্থকভাবে রূপ দিতে পারেননি। কিন্তু যখন থেকে মার্কসবাদের যুক্তিগ্রাহ্যতা ও বৈজ্ঞানিকতা সম্পর্কে তাঁর মনে আর কোন সংশয় রইলো না তখন থেকেই তাঁর লেখায় আর একরূপ—কি গল্পে

কি উপন্যাসে। খাপখোলা তলোয়ারের মতই সে রূপের ঔজ্জ্বল্য ও ধার। মানিক যেদিন থেকে কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকাতলে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে দাঁড়ালেন, সেদিন থেকে তাঁর মন হতে ফ্রয়েডীয় অপতত্ত্বের মোহ বিনিঃশেষে ঝরে গেল। মার্কসবাদের পাশে ফ্রয়েডবাদ একটা অশ্রদ্ধেয় দর্শন ভিন্ন আর কিছু নয়, ওটা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার একটা কৌশলী হাতিয়ার। ব্যক্তির অচেতন মনের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে তা সমাজে যৌথ মনের চেতনাকে আড়াল করে রাখতে চায়। শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা এ বলে না, কেবলই নির্জ্ঞান ও চেতন মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলে মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। মানিক প্রথম জীবনে এই বিভ্রমের কুহকের মধ্যে পড়েছিলেন আমাদের 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকদের দেখাদেখি। ফ্রয়েডকে গুরু মানা তখনকার কালের সাহিত্যিকদের একটা ফ্যাসান ছিল। মানিকও ওই ফ্যাসানের খপ্পরে পড়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান, সেই হেতু এই ফ্যাসানই তাঁর হাতে হয়ে উঠেছিল ক্ষুরধার এক ব্যবচ্ছেদী শলাকা, যা চিরে ফেঁড়ে মানুষের মনকে ফালাফালা করে দেখে অদ্ভুত এক আনন্দ পায়। কিন্তু এই আবেশ মানিকের লেখায় অনেককাল স্থায়ী হলেও চিরস্থায়ী হয়নি। মার্কসবাদী প্রত্যয় মধ্যপথে এসে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। মানিক, সাহিত্য জীবনের চলার পথে মার্কসবাদী বিজ্ঞানের আশ্রয় পেয়ে পুরনো পথ ছেড়ে নতুন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। নতুন মানুষ—নতুন লেখক।

॥ ২ ॥

মাসিপিসি মানিকের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। সাধারণ মানুষের অন্তরে অত্যাচারীর অত্যাচার প্রতিরোধের চেতনা কতটা দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে পারে এই গল্পটি তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। উদাহরণটি দুটি আপাত-অসহায় গ্রামীণ নারীর জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে বলে তার ফলোপযোগিতা আরও বেড়েছে। নেশাখোর অত্যাচারী স্বামীর হাতে পড়ে আহ্লাদীর দুর্দশার আর সীমা পরিসীমা ছিল না। বাপের বাড়িতে কেউ নেই, দুর্ভিক্ষে সব হেজেমেজে গিয়েছে, থাকবার মধ্যে দুই প্রৌঢ়া বিধবা—আহ্লাদীর মাসি আর পিসি। দুটিতে গায়ে গতরে খেটে সংসারটি কোনমতে টিকিয়ে রেখেছে, নিজেদেরও একটা হিল্লে তাতে হয়েছে। একদিন স্বামীর লাথির চোটে গর্ভপাতে মরমর আহ্লাদী বাপের বাড়ি এসে হাজির। বলে গিয়ে মাসিপিসিরই ভাল করে চলে না, নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না তার ঠিক নেই, তার উপর আহ্লাদীর ভার। কিন্তু মাসিপিসি এতটুকু দমে না,

আহ্লাদীকে সাদরে ঘরে আশ্রয় দেয়, শুধু তাই নয়, দত্ত নিজের বিয়ে করা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইলেও তাকে স্বামীর ঘরে যেতে দেয় না। বলে কোনদিন নেশাখোর মাতালটা 'মেয়াকে একেবারে নিকেশ করে ফেলবে তার ঠিক কী, মেয়েকে আমরা ফেরত পাঠাবো না।' এই নিয়ে দত্তর সঙ্গে মাসি-পিসির খিটিমিটি, মনোমালিন্য। কিন্তু বড় শক্ত ধাত মাসিপিসির, কিছুতেই তাদের টলানো যায় না। তারা বেঁচে থাকতে আহ্লাদীকে তারা খুনে স্বামীর ঘর করতে কিছুতেই পাঠাবে না এই তাদের ধনুর্ভঙ্গ পণ। সর্বদা আহ্লাদীকে চোখে চোখে আগলে রাখে—বাজারে কেনাবেচা করতে যাবার সময়ও আহ্লাদীকে সঙ্গে করে সালতিতে বয়ে নিয়ে যায়। ছোট এক চিলতে সালতি তার দুই ধারে দুই প্রৌঢ়া—একজনার হাতে লগি, একজনের বৈঠা। আর শুধু কি খুনে সোয়ামীর হাত থেকেই 'মেয়াকে' বাঁচানো প্রয়োজন, গাঁয়ের কামার্ত বদমাইশগুলির লোভানি থেকেও কি তাকে বাঁচানো সমান জরুরী নয়? এই দুই দায়িত্বই মাসি-পিসি সমান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

গল্পের শেষে আছে গাঁয়ের কামলোলুপ পশুগুলির কবল থেকে আহ্লাদীকে বাঁচানোর তাড়নায় মাসি ও পিসির প্রতিরোধের আয়োজন কত সংকল্পদৃঢ় ও সর্বাত্মক হয়ে উঠেছে তার একটি নিখুঁত ছবি। দুটি অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীর মনের জোরের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত চরিত্রবল যেন গল্পটির ভিতরে কথা কয়ে উঠেছে। পাঠক মনের উপর এ গল্পের প্রভাবের কোন তুলনা নেই।

হারানের নাতজামাই মানিকের শেষ পর্বের আর একটি উৎকৃষ্ট গল্প। এ গল্পটি বহুল পঠিত, উপরন্তু অভিনয়ের দৌলতে ব্যাপকভাবে পরিচিত। সুতরাং গল্পের কাঠামোটি এখানে বিস্তার করে তুলে ধরবার আবশ্যকতা নেই। তবে ময়নার মার চরিত্রটি সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এ এক আশ্চর্য চরিত্র। এর কোন জুড়ি নেই বাংলা সাহিত্যে। যে পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য আত্মগোপনকারী কৃষক নেতাকে নিজের জামাই বলে চালায় ও মেয়েকে ঘরের ভিতর ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে ঝাঁপ বন্ধ করে দেয় তার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সংস্কার জয়ের বলিষ্ঠতা তুলনারহিত। সবকিছুর উপরে তার চরিত্রে জ্বলজ্বল করছে তার দুর্মর শ্রেণী চেতনা, যা শোষক ও নিপীড়ক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অমোঘভাবে প্রযুক্ত। গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্ঘবদ্ধতা ও একপ্রাণতা এই গল্পের আর একটি মূল্যবান আয়তন। এর একটি শিক্ষণীয় দিকও আছে। পড়ে-পড়ে মার খাওয়ার চেয়ে সকলে মিলে একত্রে রুখে দাঁড়ালে যে কাজ হয় অনেক বেশী তার ইঙ্গিতে গল্পটি তাৎপর্যপূর্ণ।

পেটব্যথা গল্পের মধ্যেও সঙ্ঘবদ্ধতার একই রূপ জয় দেখতে পাওয়া যায়।

ছোট বকুলপুরের যাত্রী গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় বড় কমলাপুর অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলনের সময়কার পুলিশী সন্ত্রাসের চিত্র। পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধের তীব্রতার ভাবটিও গল্পটির ভিতর অব্যক্ত থাকেনি।

আর না কান্না গল্পটি লক্ষণীয় এই কারণে যে, ভাতের কষ্ট দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জীবনে যে কত দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে এই রচনাটিতে তার একটি মর্মান্তিক আদল পাওয়া যায়। আপাতবিচারে দেখলে মনে হতে পারে গল্পের বিষয়বস্তু কিঞ্চিৎ স্থূল কিন্তু এই স্থূলতা বহিরাবরণ মাত্র, তার পৃষ্ঠ ভেদ করে গোটা দরিদ্র সমাজের কান্না যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে একটা মর্মভেদী শূন্যতার হাহাকারে। ভাতের কষ্ট ভাতের কষ্ট মাত্র নয়, ধুঁকে ধুঁকে জীবন্মৃতবৎ বেঁচে থাকারও কষ্ট। গভীর কারুণ্যের বেদনায় গল্পটি পরিপূর্ণ।

সংগ্রামী চেতনা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বাস্তবতাবাদী কথাকার। অন্যান্য কথাসাহিত্যিকরা যেখানে চোখে অল্পবিস্তর স্বপ্নের অঞ্জন লাগিয়ে বাংলার সমাজজীবনকে চিত্রিত করেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই স্থলে সাদা চোখে এ সমাজের প্রকৃত রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এক নির্মম নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠায় তাকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। সাহিত্যকে অনেকে বলেন অতিরঞ্জনের আর্ট: যা চোখে দেখা যায় তার ঠিক হুবহু প্রতিলিপি নয়, পক্ষান্তরে তার উপর কমবেশী মায়াকাজল বুলিয়ে তাকে নয়নরঞ্জক তথা মনোমুগ্ধকরভাবে পরিবেশন করাটাই নাকি সাহিত্যের ধর্ম। অর্থাৎ মিথ্যার চর্চাই এই মতে সাহিত্যের চর্চা। এটা যে কতখানি ভ্রান্ত মত তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বকীয় সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে নিঃশেষে প্রতিপাদন করে গিয়েছেন। তিনি কি নাগরিক কি গ্রামীণ বাঙালীর সমাজকে যা-নয়-তাই দেখাবার চেষ্টায় মোহতুলিকাপাতে বর্ণিল করে আঁকেননি; তাকে তার স্ব-স্বরূপে, অর্থাৎ প্রকৃতরূপ যা ঠিক সেইভাবে, তুলে ধরবার প্রয়াস করেছেন। এতে হয়তো একাধিক যত্নলালিত, কিন্তু মূলতঃ মিথ্যা, স্বপ্নের হয়েছে সমাধি, অনেক মনগড়া ধারণা রূঢ় আঘাতে হয়েছে চূর্ণ; তাই বলে অসত্যকে সত্যের রাংতা মুড়িয়ে পরিবেশনের ব্যসনের তিনি কখনই শরিক হননি। মিথ্যার সঙ্গে আপস করে সাহিত্যচর্চা আজন্ম সত্যনিষ্ঠ এই লেখকের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

মিথ্যার সঙ্গে আপস আমাদের লেখকেরা কোথায় করেন, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে করেন? আপাতত কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কথাসাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েই বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করব। যেমন একাধিক কথাসাহিত্যিক আছেন, একালেই আছেন, যাঁরা গ্রামজীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে তার শোষণের ও বঞ্চনার রূপটি আড়াল করে তার অবাস্তব এক রঙীন চিত্র উপস্থিত করেন। যে গ্রাম হারিয়ে গেছে, অথবা লেখকের কল্পনায় ছাড়া আর কোথাও যে গ্রামের অস্তিত্ব নেই, সেই গ্রামের "গোলাভরা ধান, গোহালে দুধ, পুকুরে মাছ"-জাতীয় বর্ণনাসমৃদ্ধ এক অর্ধসত্য বা অসত্য রূপ পরিস্ফুটনে এইসব লেখকদের কখনও ক্লান্তি দেখা যায় না। সবসময় সজ্ঞানেই যে এটা তাঁরা করেন তা নয়, কখনও-কখনও অতীতের প্রতি এক ধরনের রোমান্টিক আকর্ষণের আবেগে কিংবা 'নস্টালজিয়ার' টানে ফেলে-আসা পল্লীকে আশ্রয় করে এই বস্তুভিত্তিহীন গৃহগত-প্রাণতার জোয়ারে খেলে যায় তাঁদের

লেখনীতে। এই আবেগে জমিদারদের আঁকা হয় বদান্ততার এক-একটি জলজ্যান্ত প্রতিমূর্তি ক'রে, ভূমিহীন রিক্ত দরিদ্র চাষীকে আঁকা হয় অন্তহীন সহিষ্ণুতার প্রতীক রূপে। এক পরম আত্মীয়তা বন্ধনে বদ্ধ হয়ে গ্রামের জমিদার কৃষক খেতমজুর সর্বহারা সকলে মিলে মিশে সুখে শান্তিতে বাস করছে —গ্রামের এই যে চিত্র, কিছুদিন আগে পর্যন্ত অন্ততঃ, এইটেই ছিল বাঙালী কথাসাহিত্যিকদের গ্রামচিত্রাঙ্কনের অভ্যস্ত ধারা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের এই কল্পিত স্বপ্নময় রূপের উপরকার কুহকের পর্দাটিকে এক টানে ছিঁড়ে দিয়েছেন তাঁর একাধিক গল্পে ও উপন্যাসে। তাঁর লেখায় না প্রশ্রয় পেয়েছে গ্রামের কবিত্বময় ভাবমণ্ডিত স্থিতিশীল রূপ (যেমন রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে); না, গ্রামের অভাবগ্রস্ত সাধারণ দরিদ্র মানুষের কুটিল কুঁচুলে রূপ (যেমন শরৎচন্দ্রের গল্পোপন্যাসে); না ক্ষয়িষ্ণু ও অপসৃয়মাণ জমিদারতন্ত্রের প্রতি মমত্বের আবেগ (যেমন তারাশঙ্করের লেখায়); না প্রকৃতির সৌন্দর্য-বিভ্রমে আত্মহারা হয়ে দারিদ্র্যের দুঃখ ভুলে থাকবার চেষ্টা (যেমন বিভূতিভূষণের রচনায়); না, ছেড়ে-আসা গ্রামের এককালীন মধুময় রূপের দিকে তাকিয়ে একালের শহুরে মানুষের সকাতর দীর্ঘশ্বাস (যেমন মনোজ বসুর লেখায়)। এ কোনো-কিছুই মানিকের বাস্তববাদী কলমে শিল্পের উপকরণরূপে গৃহীত হয়নি; বরং তিনি গ্রামের এই সংগ্রামচেতনা আর প্রতিরোধবিহীন স্থাণু রূপটিকে বারেবারেই করেছেন আঘাত তাঁর ক্রিয়াশীল কল্পনা দিয়ে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামের সঙ্গে পূর্বতন ঔপন্যাসিকদের দেখা গ্রামের আদল একবারেই মেলে না। এই গ্রামের মানুষগুলি প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করার উপরে আরও কিছু করে; তারা বসে বসে ভাবে, ভাবে অস্তিত্বের তাৎপর্য সম্পর্কে, নিজ জীবনের ভাগ্যের ছকটি সম্বন্ধে, নরনারীর জৈব আকর্ষণের বিচিত্র লীলারহস্য সম্পর্কে। শশী এবং কুসুম উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা, দুটি মূলতঃ ভাবুক-চরিত্র। পার্শ্ব-চরিত্রগুলি সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। মানিক তাঁর ভাবুক সত্তা এদের উপরে আরোপ করেছেন। অবশ্য এই উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণের বাধ্যতা মেনে নেওয়া হয়েছে। মানুষের জীবন ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নকস্বরূপ, অদৃশ্য সুতোর টানে সংসার রঙ্গমঞ্চে পুতুলের মতো নাচা ছাড়া মানুষের অন্য কোনো ভূমিকা নেই —ভারতীয় অদৃষ্টবাদের এই বক্তব্য পুতুলনাচের ইতিকথারও বক্তব্য। এটি স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধী বক্তব্য। মানিকের পরবর্তীকালীন বিপ্লবী শিল্প-

মানসিকতার সঙ্গে যদিও এই মত খাপ খায় না, তাহলেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই বইয়ের গ্রাম বাংলার সচরাচর-দেখা গ্রাম থেকে কিছু ভিন্নতর উপাদান দিয়ে গড়া। এই গ্রামের বহিরঙ্গ অস্তিত্বের তলায় তলায় একটি অন্তরঙ্গ জীবনের সুর ধরা পড়ে। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সজ্ঞানে এই উপন্যাসে একটি দার্শনিক আয়তন যোগ করেছেন, যে-আয়তন পূর্বের কোনো বাংলা উপন্যাসে চোখে পড়েনি। সত্য বটে এই উপন্যাসে মানিকের স্বভাবগত প্রতিবাদধর্মী বক্তব্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, বরং খতিয়ে দেখতে গেলে, তার বিপরীত বক্তব্যেরই দেখা মেলে ; তা হলেও উপন্যাসটি শিল্পগুণে অসাধারণ সমৃদ্ধ। এর মৌলিকতারও কোনো তুলনা হয় না।

অন্যপক্ষে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে শোষিত-নিপীড়িত চিরদরিদ্র ধীবর শ্রেণীর জীবনযাত্রার বাস্তব রূপটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, নির্মোহ নিরপেক্ষতায়। পূর্ববঙ্গের পদ্মাপারের জেলেরা সত্যি সত্যি কীভাবে জীবন কাটায় উপন্যাসটি তার এক বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র। এই উপন্যাসেও জৈব কামনাবাসনার রূপায়ণ আছে কিন্তু তাকে রোমান্টিকতার পরকলার মধ্য দিয়ে দেখা হয়নি, দেখা হয়েছে অভাব ও দারিদ্র্যের পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে। কপিলার প্রতি কুবেরের আকর্ষণের বর্ণনার মধ্যে বারে বারেই ফুটে উঠেছে ইন্দ্রিয়জ মোহকেও ছাড়িয়ে হতদারিদ্র্যদশাজনিত কুবেরের হীনম্মন্যতার বোধ। দারিদ্র্যের সর্বগ্রাসী চেতনা এক্ষেত্রে পরকীয়া প্রেমের প্রাবল্যকেও আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

এ তো গেল উপন্যাসের ক্ষেত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্যতন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পর গ্রামজীবনকে ভিত্তি করে যেসব ছোটগল্প লিখেছেন তার অধিকাংশেরই উপজীব্য হলো সংগ্রাম ও প্রতিরোধ। অবস্থার বিপাককে অপরিহার্য আর অখণ্ডনীয় মনে না করে তার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হওয়ার মধ্যেই রয়েছে ওই অবস্থার অবসানের নিশ্চয়তা—এমনতর ইঙ্গিত তাঁর অনেক গল্পেরই প্রাণ। দম্ভী ও প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোটা শুধু আত্মরক্ষার জন্যই দরকার তা নয়, শোষিতের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্যও দরকার ; এক অদৃশ্য দৈবের দুয়ারে নালিশ জানিয়ে ক্রমাগত পড়ে পড়ে মার খেতে অভ্যস্ত হলে মার খাওয়ার অভ্যাসটাই শুধু সার হয়, মারের প্রচণ্ডতা তাতে কমে না বরং নির্বিরোধ সহন মারের মাত্রাটাকে আরও উস্কিয়ে তোলে—এই ভাবের বক্তব্য তাঁর অনেক ছোটগল্পকেই শিল্পের স্তর থেকে ক্রিয়ার স্তরে উন্নীত করে দিয়েছে। অর্থাৎ তিনি শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষদের দুঃখবেদনা অভাব-অভিযোগের নিছক একজন শৈল্পিক রূপকার হয়েই থাকেননি, তাদের

পক্ষের একজন সাংগ্রামিকও হয়ে উঠেছেন। তিনি একাধারে শিল্পী ও 'অ্যাকটিভিস্ট্'-এর দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়ে শিল্পচর্চায় একটি নূতন আয়তন সংযোগ করেছেন। এইরকম ছোটগল্পের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক ছোটগল্প হলো—মাসিপিসি, বাগ্দীপাড়া দিয়ে, টাচায়, পেটব্যথা, হারানের নাতজামাই ও ছোট বকুলপুরের যাত্রী।

গ্রামজীবনের অবহেলিত শ্রেণীর মানুষের দুঃখ-বেদনার ইঙ্গিত আরও হয়তো কোনো কোনো কথাকার করে থাকবেন, কিন্তু কেমন করে, কোন্ পথে সেই দুঃখ-বেদনার অবসান ঘটাতে পারা যায় তার কোনো সংকেত তাঁদের রচনায় পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শরৎচন্দ্রের নাম করতে পারা যায়। তিনি তাঁর কোনো কোনো রচনায় সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের সীমাহীন দারিদ্র্যের ইঙ্গিত করেছেন কিন্তু কী উপায়ে সেই দারিদ্র্যের নিরাকরণ হতে পারে তার কোনো পথনির্দেশ করে যেতে পারেননি। অর্থাৎ তিনি সমস্যা উপস্থিত করেছেন কিন্তু তার সমাধান দেননি কিংবা সমাধান তাঁর জানা ছিল না। 'মহেশ' গল্পের গফুর দারিদ্র্যের জ্বালা সইতে না পেরে কন্যা আমিনার হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে শহরের কলে কাজ করতে চলে গেল—এটা কোনো সমাধানই নয়। বরং এর মধ্যে আছে পরাজয়ের দ্যোতনা, বিরূপ ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণের অসহায়তা। তারাশঙ্কর গ্রামের নবধনিকের লোভ-লালসাকেই চিত্রিত করেছেন কিন্তু কেমন করে ওই লোভ-লালসাকে জব্দ করতে হয় তার কোনো পথ বাতলাননি। তিনিও সমস্যার উত্থাপন করেই খালাস, সমস্যার মীমাংসার কোনো সমাজতন্ত্রসম্মত পথের ইঙ্গিত তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায় না।

এই দুই লেখক এবং এই ধারার অন্যান্য লেখকদের থেকে মানিকের পার্থক্য এইখানে যে, তিনি একইকালে সমস্যা ও তার সমাধানের পথের হদিস দিয়েছেন। সমস্যার রূপায়ণে তিনি শিল্পী, সমাধানের পথনির্দেশে তিনি সাংগ্রামিক। মানিকের এই এককালীন যুগ্ম ভূমিকা তাঁকে এমন এক অনন্যতা দিয়েছে যার কোনো পূর্বনজির বাংলা সাহিত্যে নেই। এ সম্বন্ধে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থের লেখক ডক্টর সরোজমোহন মিত্র যথার্থই লিখেছেন যে, "অন্যান্য সাহিত্যিকদের থেকে মানিকের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। তিনি কেবল দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করেননি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা মুখ বুজে অসহায় অবস্থাকে স্বীকার করেনি, প্রয়োজনবোধে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। মানিক তাদের সজীব এবং প্রতিবাদী মানুষ গড়ে তুলে এক নতুন আদর্শ সৃষ্টি করেছেন।"

অন্যদিকে, শহরের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে যে

অহেতুক সম্ভ্রমচেতনা ও গদগদ ভাব আছে তাকেও তিনি কঠোর বিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন বরাবর। তথাকথিত 'ভদ্রলোগ' শ্রেণীর মানুষদের স্বার্থপরতা নীচতা হীনতা দেখে দেখে মানিকের এই ধারণা হয়েছিল যে, এদের চেয়ে খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষেরা—শ্রমিক-কৃষকেরা—অনেকগুণ বেশী ভাল, কি সততার দিক দিয়ে, কি স্বার্থশূন্য আচরণের ক্ষেত্রে। শ্রমিক-কৃষকদের শিক্ষার পালিশ না থাকতে পারে কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মতো তারা কপট নয়, পরের মঙ্গলচিন্তা আদৌ না করে নিরন্তর আত্মসুখ সন্ধানে ব্যস্ত নয়। কারখানার মজুর কিংবা ক্ষেতের হালচাষীর কথাবার্তা-ব্যবহার আশানুরূপ মার্জিত না হতে পারে, তাদের রুক্ষ অসংস্কৃত চলন-বলন নাগরিকরুচিবাগীশদের এমনকি তাচ্ছিল্যেরও উদ্রেক করতে পারে, কিন্তু তাদের সব অপূর্ণতার শোধন হয়েছে তাদের অপরিসীম প্রাণবত্তায়, পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করতে পারার বিরল ক্ষমতায়। ভদ্রলোকদের মতো তারা দুঃখবিলাসী ভণ্ড নয়, তারা সত্যি সত্যি পরের বিপদে এগিয়ে আসতে জানে, দশের কাজে নিজের কাঁধ লাগাতে জানে। 'সহরতলী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র যশোদা তার ভাতের হোটেলে হাড়্‌ভাতে জেনেও চাষী মজুর শ্রেণীর লোকদের জায়গা দিতে দ্বিধা করে না কিন্তু ভদ্রলোগনামীয় 'বাবুদের' সেখানে প্রবেশ নিষেধ। বাবুদের সম্পর্কে যশোদার এই বিরাগ হীনমন্যতা জাত নয়, এর মূলে আছে ভদ্রলোগদের আচার-আচরণ সম্পর্কে তার দীর্ঘদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। "ভদ্রলোকেরা নাকি বড় বেশী ছোটলোক···তার চেয়ে কুলি-মজুর ভাল।" 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পগ্রন্থের নতুন সংস্করণের (১৩৫২) ভূমিকায় মানিক লিখেছেন—"প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে—একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মর মর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। তখন জানা ছিল না যে ওগুলি জীবনযুদ্ধের ক্ষত নয়, জরার চিহ্ন, ভাঙনের ইঙ্গিত; জানা ছিল না যে, স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল—সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।···মধ্যবিত্ত ভদ্রদের পরিণাম জানতাম না;

বটে, তবে পচা ভদ্রতার মিথ্যা খোলস খুলে সবাই ছোটলোক হোক এ পরিণাম যে কামনা করতাম, আমার অনেক গল্পেই তা ঘোষণা করার চেষ্টা করেছি।”

পক্ষান্তরে ধনিক-বণিক-শোষক সম্প্রদায়ের মানুষগুলির সম্পর্কে মানিকের মনোভাব ছিল অত্যন্ত তিক্ত ও কঠোর সমালোচনা-প্রবণ। পরকে না ঠকিয়ে যে কেউ ধনী হতে পারে না, এই প্রতিপাদ্য তাঁর একাধিক ছোটগল্পের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, কি চরিত্র পরিকল্পনায় কি মন্তব্য প্রকাশের ধারায়। ‘বৌ’ পর্যায়ের গল্পগুলির ভিতর ‘কুষ্ঠরোগীর বৌ’ নামে একটি গল্প আছে। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত যতীনের বাবার ধনী হওয়ার কাহিনী বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক লিখছেন—“একথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া ?…কম এবং বেশী অর্থোপার্জনের উপায় তাই একবারে নির্ধারিত হইয়া আছে, কপালের ঘাম আর মস্তিষ্কের শয়তানী। কারো ক্ষতি না করিয়া জগতে নিরীহ ও সাধারণ হইয়া বাঁচিতে চাও, কপালের পাঁচশো ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা অর্জন কর : সকলে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিবে। কিন্তু বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ কর।…ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে পার তাহাদের সিন্দুক খালি করিয়া নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমাও।…ধনী হওয়ার এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।”

এই মন্তব্য এতই প্রত্যক্ষ আর স্বপ্রকাশ যে এর উপর আর টীকা-ভাষ্য করার আবশ্যকতা হয় না। অত্যন্ত চোখা-চোখা আর চাঁছাছোলা কথায় বিত্তভজনাকারী সমাজের প্রকৃত রূপটি সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন রিয়ালিস্ট লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোনো কোনো লেখক রিয়ালিজম বলতে বোঝেন সমাজের নগ্ন নিরাবরণ যৌন অবক্ষয়ের চিত্রের উন্মোচন। এবং এটাকে অজুহাত স্বরূপে খাড়া করে—নরনারীর স্থূল জৈব আকর্ষণের বেআব্রু কাহিনী ফেঁদে বাস্তববাদী লেখকরূপে আত্মপ্রসাদ ও লোকের বাহবা কুড়োতে ব্যগ্র হয়ে পড়েন। বাস্তববাদ সম্বন্ধে নিতান্ত অপরিপক্ক ও বালখিল্য ধারণারই এ নিদর্শন। শুধু তাই নয়, এঁরা গর্কি আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নিজেদের 'মর্বিডিটি'-র অনুকূলে সমর্থন খুঁজতে চেষ্টা করেন। ভাবখানা এই যে, গর্কি আর মানিকের সঙ্গে নিজেদের নাম সমস্বরে উচ্চারণ করলেই বুঝি তাঁরা গর্কি আর মানিকের সমগোত্রের লেখক হয়ে গেলেন। অসার আত্মতুষ্টির এ এক হাস্যকর উদাহরণ।

মানিক সমাজের সত্য রূপ ফুটিয়ে তোলবার আগ্রহে কখনও কখনও তাঁর

চরিত্র রূপায়ণে ও কাহিনীর-ধারায় দেহবাদী বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন সন্দেহ নেই (যেমন 'অহিংসা', 'দর্পণ', 'চতুষ্কোণ' প্রভৃতি উপন্যাসের কোনো কোনো অংশে এ কথার সাক্ষ্য মেলে), কিন্তু সে কিসের প্রেরণায় ? এই সভ্যতার বাইরের জলুষ আর চটকের আড়ালে একটা যে পচা-গলা-বিকৃত বাস্তব আত্মগোপন করে আছে এবং ভদ্রতার চতুরালীটা যে প্রায়ই ওই অলজ্জ সত্যকে ঢাকবার একটা মুখোশ মাত্র, সেইটে দেখাবার তাগিদ থেকেই মানিক মাঝে মাঝে এই ধরনের দেহচিত্রের উদ্ঘাটন করেছেন তাঁর রচনায়। নয়তো নিছক দেহবাদের জন্য দেহবাদ, মর্বিডিটির খাতিরে মর্বিডিটি, পাঠকের রিরংসাকে খুঁচিয়ে তুলে দেহবাদী গল্প-উপন্যাস থেকে ফায়দা তোলা, যা কিনা এখন একাধিক লেখকের বেসাতি হয়ে দাঁড়িয়েছে—এ কখনও জাত-লেখক মানিকের কাছে আমল পায়নি। প্রথম দিকে যদি-বা কখনও মনোবিকলনের বিভ্রমে ভুলে তিনি মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে তাঁর চিন্তার পাল্লাকে দেহের দিকে একটু বেশী মাত্রায় হেলিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে, বিশেষতঃ সাম্যতন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে, তাঁর এই ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের ক্ষতিকর অভ্যাস প্রায় সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছিল বলা চলে। শেষ পর্বের মানিক-সাহিত্য সংগ্রামী চেতনায় পূর্ণ, খাপখোলা তলোয়ারের মত সোজা সরল দৃপ্ত। সংগ্রামের কারণ থাকে বহির্জীবনে, সংগ্রাম চালাতেও হয় বহির্জীবনকে আশ্রয় করেই ; কাজেই সংগ্রাম বরাবরই বস্তুভিত্তিক বহিরঙ্গজীবনাশ্রিত। সংগ্রামের প্রকরণের ভিতর কখনও নির্জ্ঞান মনের অন্ধকার গলিঘুঁজির তত্ত্ব লওয়ার অবসর থাকতে পারে না। মানিকের উপলব্ধিতে যখন থেকে এই সত্য তত্ত্বগতভাবে প্রতিভাত হয়েছে তখন থেকেই তিনি মনস্তাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদমূলক গল্প লেখার অভ্যাস থেকে সরে গিয়ে বস্তুভিত্তিক গল্প লেখার দিকে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর শেষের দিকের লেখায় মনের জটিল আলো-আঁধারির বিশ্লেষণ-চেষ্টা কম, পক্ষান্তরে সংগ্রামী মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের যে খররৌদ্রালোকিত জগৎ, তার আভাসন বেশী। কৃত্রিম বিজ্ঞান থেকে মনোযোগ প্রত্যাহার করে নিয়ে সত্যিকার বিজ্ঞানে মনোযোগ সঞ্চালনের ফলেই যে শিল্পরীতির এই প্রত্যাশিত প্রগতিশীল বিবর্তন ঘটেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শেষ বয়সের তিনটি উপন্যাস

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনের উত্তর পর্বে পর পর অনেকগুলি উপন্যাস লেখেন। উপন্যাসগুলির কোনটাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ধরনের নয়, বরং পরিকল্পনা ও রূপায়ণের দিক দিয়ে একজন সিদ্ধশিল্পীর অভ্যাসগত লেখ্যবৃত্তির রুটিন কর্মের মধ্যে পড়ে। যে সময়ে মানিক এই যান্ত্রিক অভ্যাস সঞ্জাত উপন্যাসগুলি লিখছিলেন তখন তিনি খুবই অসুস্থ। দেহের অসুখ যেমন তাঁকে আদৌ স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না তেমনি দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সঙ্গে মনও নানা কারণে ভগ্ন হয়ে এসেছিল। চূড়ান্ত অর্থাভাবের মধ্যে দিনগুলি কাটছিল অথচ নেশার উপকরণ সংগ্রহ না করলেও নয়,—এমনি একটা যন্ত্রণাদায়ক টানাপোড়েনের তখন তিনি শিকার। নেশাসক্তি বড়ই ক্ষতিকর, কেননা সেটা দাসত্বের ব্যাপার, নিয়তির মত নির্মম এক বদখেয়ালের কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণের দুঃখজনক দৃষ্টান্ত।

অভাবের কারণে পরিবারে অশান্তি লেগেই আছে। উপার্জিত যে-অর্থের দ্বারা পরিবারের মানুষগুলির গ্রাসাচ্ছাদনের কিছু-কিঞ্চিৎ সুব্যবস্থা হতে পারত, সে-উপার্জনের বেশ কতক অংশ পানাসক্তির পায়ে ঢেলে দেওয়া হতে থাকলে কোন্ পরিবারে শান্তি বজায় থাকতে পারে? পরিবারের কর্তা ব্যক্তিটি তাঁর অভ্যাসগত অস্থিরচিত্ততা আর অনুচিত নেশার মাশুল জোগাতে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন আর তাঁর স্ত্রী ও পোষ্যবর্গ নিত্য অনটনের দায়ে কষ্ট পাবেন —এই পারিবারিক অসামঞ্জস্যের যে-অনিবার্য বেদনাদায়ক ফলশ্রুতি, তা মানিকের মত একজন স্বভাব-হৃদয়বান অনুভূতি-পরায়ণ সন্তানবৎসল শিল্পী মানুষের অন্তরে কী গভীর অনুশোচনার আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

তা ছাড়া, এ জিনিসের আরেকটা দিকও ভাববার আছে। নিজে যিনি নেশার বশ তিনি তো সহায়হীন এক সত্তা, পরকে তেমনভাবে সহায়তা দেওয়া, তেমনভাবে চালনা করা তাঁর পক্ষে কি সম্ভব? স্বয়ংচালিত ব্যক্তি পরের সঞ্চালক কেমন করে হয়?

এই রকমের মানসিক আলোড়ন-বিলোড়নের মধ্যেই মানিকের উত্তর পর্বের বেশীর ভাগ বই লেখা। উপন্যাসগুলিতে ব্যক্তচিন্তা প্রায়শঃ ছাড়া-ছাড়া, অসংলগ্ন, সেগুলির কাহিনীগ্রন্থন শিথিল ও বাক্যবন্ধ কমবেশী অযত্ন ও অমনোযোগের কারণে কাটা-কাটা সংক্ষিপ্ত স্বল্পশব্দাশ্রয়ী। লেখায় ক্লান্তির

ছাপ স্পষ্ট, শুধু দীর্ঘদিনের অভ্যাসের জোরেই লেখনী চালনাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখার চেষ্টা ; সর্বোপরি জীবিকার সর্বগ্রাসী দায় ও প্রকাশকের ফরমায়েসের চাপ একসঙ্গে মিলিত হয়ে লেখককে কলমের দাসত্বে নিযুক্ত রাখা—এই হলো শেষ বয়সের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক জীবনের সচরাচরের চিত্র।

তবু প্রতিভা থাকলে অসম্ভবও যে সম্ভব হয় এবং জিরজিরে হাড়েও যে ভেল্কির খেলা দেখাতে পারে মানিকের এই উত্তরকালীন উপন্যাসগুলির মধ্যে তার প্রমাণের অভাব নেই। উপন্যাসগুলি উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হলেও এবং সেসব যেমন-তেমন করে লেখা হলেও সেগুলি যে একজন প্রতিভাবান উচ্চকোটির শিল্পীর কলমের সৃষ্টি তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

১৯৫২ সাল থেকে মৃত্যুর বৎসর ১৯৫৬ সালের মধ্যে মানিক এই উপন্যাসগুলি লেখেন—ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২), পাশাপাশি (১৯৫২), সার্বজনীন (১৯৫২), আরোগ্য (১৯৫৩), তেইশ বছর আগে পরে (১৯৫৩), নাগপাশ (১৯৫৩), চালচলন (১৯৫৩), শুভাশুভ (১৯৫৪), হরফ (১৯৫৫), পরাধীন প্রেম (১৯৫৫), হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)। মৃত্যুর ঠিক পরে প্রকাশিত হয় প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান (ডিসেম্বর, ১৯৫৬)।

মাত্র পাঁচ বছর সময়-পরিধির মধ্যে কমসে-কম তেরোখানি উপন্যাস প্রণয়ন করা স্বল্পশক্তির পরিচায়ক নয়। স্বাস্থ্য যখন ভগ্ন, মন বিপর্যস্ত, তখনও ক্ষমতার কী সচলতা! আর সমাজ জীবন ও সংসার জীবনের নানাবিধ খুঁটিনাটির প্রতি কী সুতীক্ষ্ণ মনোযোগ, যে-মনোযোগের অসংশয় পরিচয় উল্লিখিত তালিকা-পঞ্জীর প্রতিটি উপন্যাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে। এর থেকে বোঝা যায় প্রাণের প্রদীপের তেল ক্রমশঃ ফুরিয়ে এলেও জীবনের প্রতি আসক্তির রস ফুরোয়নি, মানুষের প্রতি মমতা কমেনি। আর লেখার এই অজস্রতা থেকে প্রমাণ হয় ওই অসহনীয় রুগ্ন অবস্থার মধ্যেও বাঁচার জন্য কী সীমাহীন লড়াই তাঁকে চালিয়ে যেতে হয়েছে জীবনের শেষদিন অবধি। রচনার প্রাচুর্য এ ক্ষেত্রে রচনার স্ফূর্তির প্রমাণ বহন করছে না, প্রমাণ বহন করছে একটা গোটা পরিবারের জন্য জীবিকা নির্বাহের প্রাণান্তকর তাগিদ, সংসার রক্ষার দায়-দায়িত্ব পালনের সৃষ্টিকর্মের মধ্যেও যে কত নিরুপায়তার বেদনা লুকিয়ে থাকে এটা তারই দ্যোতক।

পূর্বোক্ত তেরোটি উপন্যাসের মধ্যে আপাতত আমি তিনটি উপন্যাসের ওপর মনোযোগ অর্পণ করতে চাই। আলোচ্য তিনটি উপন্যাস হলো পাশাপাশি, সার্বজনীন, আরোগ্য। এর প্রথম দুটি ১৯৫২ সালে প্রকাশিত, তৃতীয়টি ১৯৫৩য়।

পাশাপাশি সুনীল নামক এক আদর্শবাদী যুবকের কাহিনী, যার কাছে হৃদয়ের মূল্য কম, আদর্শের দামটাই বেশী। সুনীল কর্তব্যনিষ্ঠ দায়িত্বশীল সাংসারিক মানুষ। সুনিয়মে সংসার চালানোর জন্য সে ভাবাবেগকে তার জীবনের পরিকল্পনার মধ্যে মোটেই স্থান দেয় না। ছোট ভাই ও বোনেদের কাছে সে পারিবারিক কর্তব্য পালনের একটি শুষ্ক বিগ্রহ স্বরূপ যার কাছে হৃদয়বৃত্তির দাম খুব সামান্যই অথবা নেই বললেই চলে। নারীর প্রেম তার কাছে কমবেশী অর্থহীন। মেয়েদের ভাবভালবাসাকে সে বিশেষ কোন মূল্য দেয় না, শুধু তাই নয়, তাদের ভাব-ভালবাসার প্রকাশ্য অভিব্যক্তিকে সে ন্যাকামি বলেই মনে করে।

লৌকিক মানদণ্ডে সুনীলকে হৃদয়হীন মনে করাই স্বাভাবিক, কিছুটা নিষ্ঠুর ও নির্মম, কিন্তু যখন বিচার করা যায় সুনীলের এই নীতি-নিয়ম নিষ্ঠার পিছনে বৃহত্তর একটা সামাজিক প্রেক্ষিত জড়িয়ে আছে, আছে বহু মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা এর সঙ্গে যুক্ত, তখন আর তার প্রতি ততটা নিষ্করুণ হওয়া যায় না।

মায়া ও ছায়া দুই বোন। মায়া তাদের সংসারের প্রয়োজনে নিজে অবিবাহিতা থেকে একটি টাইপ-রাইটিং স্কুল পরিচালনা করে। সুনীল এখানে পার্ট-টাইম কাজ করত ও মায়াকে নানারকম উপদেশ-পরামর্শ দিয়ে চালাত। মায়ার অন্তরের একান্ত গোপন বাসনা ছিল সুনীল তাকে গ্রহণ করবে কিন্তু সুনীল যখন সত্যিসত্যি বিবাহের প্রস্তাব করে মায়া পেছিয়ে যায়।

সুনীল আস্তে আস্তে মায়ার বৃত্ত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নন্দা নামক এক বিধবা তরুণীর সংবাদপত্র চালনার কাজের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করে। নন্দা তার স্বামীর অবর্তমানে তাঁর স্বামীর প্রতিষ্ঠিত 'পীপলস ভয়েস' নামক কাগজটির মালিক হয়ে বসেছে। সুনীল এ কাজে নন্দাকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করে। সুনীলের লেখবার ক্ষমতা প্রচুর, দরিদ্র ও শোষিত জনদের পক্ষ নিয়ে লেখায় তার কলম থেকে যেন আগুন ছোটে। তার সাহিত্য বোধও যথেষ্ট প্রখর এবং ওই পত্রিকায় কাব্য-সাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধ লিখে খুবই নাম করেছে। এদিকে পত্রিকা পরিচালনার সংগঠন নৈপুণ্যও যথেষ্ট। নন্দা সুনীলের নানাবিধ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তাকে পত্রিকার অংশীদার করে নেয়। কিন্তু তাদের সম্পর্ক একান্তভাবেই সহযোগিতার সম্পর্ক, নিষ্কলুষ বন্ধুতার সম্পর্ক—এর মধ্যে হৃদয়তাপের কোন ব্যাপার নেই। সুনীল সে সবের ধার দিয়েও যায় না। অপসংস্কৃতির বেসাতিওয়ালা কোন লেখক হলে এই থানটাতে 'মওকা' বুঝে দুইয়ের সম্পর্ককে রসিয়ে মজিয়ে কেচ্ছার চূড়ান্ত করে ছাড়ত কিন্তু মানিক

যেহেতু দায়িত্বশীল শিল্পী এবং সুনীলের চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিঃস্বার্থ জনসেবার একটা আদর্শ তুলে ধরতে চান সেই কারণে ওই প্রকার রগরগে প্রেম বর্ণনের প্রলোভন তিনি এক্ষেত্রে কঠোরভাবে সংবরণ করেছেন।

পীপলস ভয়েস সত্যিই জনসাধারণের কাগজ। এই কাগজে অত্যাচারিত-শোষিত শ্রেণীর অভাব-অভিযোগের কথাই বিশেষভাবে স্থান পায়। সুনীল বলে 'নিরপেক্ষ', নির্দলীয় কাগজ বলে কোন কাগজ থাকতে পারে না। ওটা 'সোনার পাথর বাটীর' মত একটা ছেঁদো কথা। হয় পত্রিকাকে এ পক্ষ অথবা ও পক্ষ অবলম্বন করতে হবে—হয় বড়লোকের পক্ষ, নয় গরীবের পক্ষ। সুনীলরা জেনেবুঝেই গরীবের পক্ষাবলম্বন করেছে।

কিন্তু পত্রিকা চালাতে ও বাড়াতে হলে টাকা চাই। টাকা আসবে কোত্থেকে? নন্দার সম্বল ফুরিয়ে এসেছে, সুনীলকে তাই হন্তে হয়ে টাকার জন্য ঘুরতে হয়। ধনী ব্যবসায়ী অঘোরবাবুর ফার্মে সুনীল একদা কাজ করত। অঘোরবাবুর কাছে গিয়ে হাত পাতলে কেমন হয়? কিন্তু অঘোরবাবু ঘুঘু লোক। বলেন, টাকা দিতে পারেন তিনি দুই সর্তে। এক, তাঁর অমনোনীত কোন বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশ করা চলবে না; দুই, কাগজে আমেরিকাকে গাল দেওয়া চলবে না। সুনীল এ দুই শর্তের কোনটাই মেনে নিতে রাজী নয়। তাই অর্থ সাহায্যের আলোচনা ভেস্তে গেল।

এদিকে অঘোরবাবুর বয়স্থা অনূঢ়া খোঁড়া মেয়ে বিভা সুনীলের প্রেমে ডগমগ। সুনীল তার প্রতি উদাসীন বলে তার প্রেম যেন সুনীলের প্রতি আরও বেশী প্রধাবিত হয়। নারী পুরুষের সম্পর্কের লীলাই বোধকরি এই রকম। বিভা সুনীলকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চায়, কিন্তু ঘোরেল পিতা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের উপর 'ইনজাংশন' জারী ক'রে মেয়ের মতলব ব্যর্থ করেন। শেষমেষ বিভা মরিয়া হয়ে বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সুনীলের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পঙ্গু কন্যার প্রতি স্নেহদুর্বল পিতা শেষ অবধি মেয়েব জেদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, সুনীল বিভাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে পত্রিকার আর্থিক সমস্যার সমাধানে একটি মস্তবড় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভালবাসার ওপরে কর্তব্যের প্রেরণা জয়ী হয়।

পাশাপাশি উপন্যাসে অলস ও বিলাসী ধরনের গতানুগতিকপন্থী একজোড়া নরনারীর মধ্যে সচরাচর প্রচলিত মন-দেওয়া-নেওয়ার অভ্যাসের অন্তঃসারশূন্য যে-সংস্কারটি সচরাচর ক্রিয়াশীল থাকে, তার পরাজয় চিত্রিত হয়েছে। মানিকের প্রখর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দৃঢ়ভিত্তির উপরে এ উপন্যাসটির প্রতিষ্ঠা।

সার্বজনীন উপন্যাসের মূলচরিত্র পরমেশ্বর সদানন্দময় অকৃতদার প্রৌঢ়, সকলের সুখদুঃখের সে বার্তা নিতে সদাতৎপর কিন্তু নিজে সংসারে আসক্তি-বিহীন। ভাড়াটে ঘরে একা একা বেশ জীবন কাটছিল কিন্তু হঠাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে ভাই ও ভাইয়ের সংসার হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। বাড়ীওয়ালীকে বলে তাদের সঙ্কুলানের জন্য একতলায় আরও কখানি ঘর ভাড়া নিতে হলো। পরমেশ্বর এতদ্‌সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করে কিন্তু এজমালী সংসারে চাইলেই কি গা বাঁচিয়ে চলা যায়?

ভাইয়ের নাম মহেশ্বর, স্ত্রী সুহাসিনী, পুত্র সাধন, কন্যা সুরমা ও প্রতিমা। সবিতা ওদের সংসারেই আশ্রিতা কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন বলে স্বোপার্জনের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরতার পথ খুঁজে নেয়। সে-ই পুরুষ সেজে মহেশ্বরের গোটা পরিবারটিকে পূর্বপাকিস্তান থেকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। বাড়ীওয়ালা বিধুভূষণের ছেলে সমীর সুরমাকে বিয়ে করে কিন্তু বিয়ের পর সে বখে যায় এবং নানা বদখেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত শ্বশুরের টাকা চুরি করে। ওর জন্যই মহেশ্বরদের সংসারে কঠিন অর্থকৃচ্ছ্রতা নেমে আসে। পরমেশ্বর এতদিন দিলদরিয়া মেজাজে ভাইয়ের ওপর পড়ে পড়ে খাচ্ছিল এখন চাকরীর সন্ধান করতে বাধ্য হয়। এদিকে ভাইপো সাধন সবিতার সঙ্গে মিলে একত্রে নানা টুকিটাকি জিনিস ফিরি করে রোজগারের পথ খুঁজে নেয়। ছোট বোন প্রতিমা বিয়ে করে পঙ্কজ নামে এক আদর্শবাদী সমাজসেবী যুবককে।

বিধুভূষণের কন্যা পদ্মার সঙ্গে অধ্যাপক সুরঞ্জনের বিয়ে হওয়ার কথা হয়েছিল কিন্তু সুরঞ্জনের খুঁতখুঁতে হিসাবী স্বভাবের জন্য পদ্মা এই বিয়ে ভেঙে দেয় এবং কাঞ্চিলাল নামে এক ড্রাইভারকে বিয়ে করে।

প্রতিবেশী কয়েকটি চরিত্রও উপন্যাসটির মধ্যে কুশীলব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। যেমন, কালোবাজারী ব্যবসায়ী সদাশিববাবু, অবসরপ্রাপ্ত হাকিম বিনোদবাবু, জিতেন, অঘোর, ডুমুর প্রভৃতি।

উপন্যাসটির একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে। আত্মকেন্দ্রিক ভাবে নয়, সকলে মিলে মিশে পরস্পরের সুখদুঃখের ভাগী হয়ে বাঁচবার চেষ্টা করলে জীবন সার্থকতা পায়—এইটিই এই উপন্যাসের তাৎপর্য।

বইয়ের কয়েকটি স্মরণীয় উদ্ধৃতি:

১। "ধনীর চেয়ে বড় জঞ্জাল জগতে আর নেই? পুরানো পচাগলা সংস্কার ও প্রবৃত্তির সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, সভ্যতাকে ব্যর্থ করার সবচেয়ে বড় অজুহাত। এ আঘাত কি মানুষ ভুলতে পারে?"

২। "কেবল নিজের হিসেব ধরলে কি আজকের দিনে চলে? দশজনের কথা ভাবতে হয়।"

৩। "দশটা মানুষের জীবনের সুখদুঃখের অংশীদার হলে, দশজনের লড়াইয়ে ভাগ নিলে জীবন বেশ জমে যায়।"

আরোগ্য একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। অবশ্য মানিকের সব উপন্যাস কমবেশী মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস কিন্তু যেহেতু এই উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব মনোবিকলনের রূপ পেয়েছে সেই কারণে একে আরও বেশী করে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা যায়। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র কেশব ড্রাইভার। কালোবাজারী টাকায় ধনী অনিমেষের গাড়ী চালায়। অনিমেষের সুন্দরী কন্যা ললনার প্রতি কেশবের এক ধরনের মুগ্ধতা আছে, সেটা ঠিক ভালবাসা নয়, তবে একটা আকর্ষণ। ললনা যে অর্ধশিক্ষিত ড্রাইভার কেশবকে ড্রাইভার বলে ছোট নজরে দেখে না বরং তার সঙ্গে বেশ ভালই ব্যবহার করে এতে কেশব ললনার প্রতি রীতিমত কৃতজ্ঞতা বোধ করে। ললনা গান গায়, সভা সমিতিতে ও আসরে গান গেয়ে নাম করেছে। কেশব গাড়ী চালিয়ে ললনাকে এসব জায়গায় নিয়ে যায়, বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এই সাহচর্য কেশবের বেশ ভালই লাগে এবং অসাধু উপায়ে বিত্তবান অনিমেষকে মনে প্রাণে ঘৃণা করলেও তার সুভদ্র কন্যার এই সান্নিধ্যসুখ লাভের জন্য দিনমানের যত বেশীক্ষণ সম্ভব মনিবগৃহে অবস্থান করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু সন্ধ্যা হলেই কেশব তার শহরতলীর বাড়ীতে ফেরবার জন্য ছটফট করতে থাকে। তাকে আর তখন শহরে আটকে রাখা যায় না। কেশবের শহরতলীর বাড়ী যেখানটায় তারই পাশে বাস করে অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা সম্বলিত এক বড় পরিবার। ওই পরিবারের আশ্রিতা বিধবা মায়ার ওপর রাঁধাবাড়া ও কাচ্চাবাচ্চাগুলিকে খাওয়ানো শোয়ানোর দায়িত্ব। কেশব ও মায়া পরস্পরের প্রতি আসক্ত এবং মায়ার ঘর গেরস্থালীর পাট চুকে গেলে ওরা দুজন প্রায় প্রতি রাত্রে নিভৃতিতে গোপনে মিলিত হয়।

একদিকে শহুরে মেয়ে ললনা অন্যদিকে গ্রাম্য রমণী মায়া—এই দুইয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত কেশবের মন। এই দোটানার দ্বন্দ্ব থেকে তার হয় মানসিক রোগ। সর্বদা মাথা ঘোরে, বিতৃষ্ণ ভাব, সব কাজেই নিরুৎসাহ, অবসাদ। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা সে নিজের চিকিৎসা করায়। ডাঃ দত্ত প্রশ্ন করে করে তার গোটা কেস হিষ্ট্রী খুঁচিয়ে বার করেন

(এইখানে মানিকের মনোবিকলন বিদ্যা যে কতখানি অধিগত ছিল তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ মেলে—লেখক)। কেশবের মনকে চিরে-ফেঁড়ে ব্যবচ্ছেদ করে ডাঃ দত্ত দেখান 'সফিস্টিকেটেড' প্রেম আর জৈব কামনামূলক প্রেমের মধ্যে সংঘাতের মন্থন থেকেই কেশবের যা কিছু অসুখ ও মানসিক জটিলতা।

চিকিৎসার ফলে এবং ক্রমশঃ বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কেশব উপলব্ধি করে তার রোগ তার নিজের মধ্যে নয়, সমাজব্যবস্থার অনিয়মের মধ্যে। সমাজ-ব্যবস্থার অনিয়মের শোধন হলে তার রোগও সেরে যাবে। এই উপলব্ধিতে কেশবের রোগ বাস্তবিকই অর্ধেক সেরে যায়, সে আরও অনুভব করে সমাজব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা দূরীকরণে সে হাতে কলমে কাজে লাগলে তার রোগ যাবে পরিপূর্ণ সেরে। আত্মকেন্দ্রিকতাই মানুষের যাবতীয় ব্যাধির মূল ও আত্মকেন্দ্রিকতা ঘুচলে ব্যাধিরও আরোগ্য।

দু-একটি উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি:

১। "যে অনিয়মের জন্য তার রোগ, সেটা রয়েছে সংসারে। সংসারটা না পাল্টালে অনিয়মটা যাবে না। তার রোগও আরোগ্য হবে না।"

২। "কেশব বলে···সবার জীবন শুধরে দেবার লড়াই করব ঠিক করতে রোগ যেন অর্ধেক কমে গেছে। লড়াই আরম্ভ করলে নিশ্চয়ই আরোগ্য।"

তিনটি পারিবারিক উপন্যাস

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ বয়সের লেখা তিনখানি পারিবারিক উপন্যাস—পরাধীন প্রেম (১৯৫৫), মাশুল (১৯৫৬, জীবদ্দশায় সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস) ও প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান (ডিসেম্বর ১৯৫৬, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত)। এই তিনখানি উপন্যাসেরই বিষয়বস্তু বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত। পরিবার জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি মানিকের দৃষ্টি যে কত সজাগ ছিল এবং যে কোন মধ্যবিত্ত সংসারের জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম যে তাঁর মনোযোগকে কত উদগ্রভাবে অধিকার করে থাকত এই তিনটি উপন্যাস পড়লে সে কথা ভাল করে বোঝা যায়।

শেষ বয়সের উপন্যাস রচনায় এই যে তিনি সমাজের বৃহত্তর ও মহত্তর পটভূমি থেকে দৃষ্টি প্রত্যাহরণ করে নিয়ে পারিবারিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ পুঙ্খ-অনুপুঙ্খের উপর তাঁর মনোযোগ মুখ্যতঃ স্থাপন করেছিলেন সেটা কি তাঁর সৃষ্টিশীলতার ক্রমক্ষীয়মাণতা বোঝায়? অথবা বোঝায় কল্পনার আপেক্ষিক দৈন্য?

এ বিষয়ে সঠিক বলা মুশকিল তবে এটা ঠিক, মানিক যে-সময়ে এই উপন্যাসগুলি রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন সে-সময়ে তিনি প্রচণ্ড শারীরিক ব্যাধি ও মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এই সময়ে একটা পর্বে তিনি হাসপাতালেও কাটিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর মানসিক চিকিৎসাও চলছিল। ব্যাধির পীড়ন ও শারীরিক-মানসিক ক্লেশের সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়েছিল নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা। তাতে তাঁর জীবনযাত্রা আরও অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। নানাবিধ বিকলতার কারণে তাঁর চিন্তা অসংলগ্ন, কল্পনানির্মাণক্ষমতা শ্লথ হয়ে এসেছিল। কেবল সংসার প্রতিপালনের অনতিক্রমা বাধ্যতার তাড়নায় জীবিকা নির্বাহের তাগিদে প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই শুধু তিনি তাঁর কলমকে সচল রেখেছিলেন—ওই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পরের পর উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে চলেছিলেন।

১৯৫২-৫৩ সাল থেকেই এই অবস্থার শুরু। তখনকার লেখা উপন্যাস পাশাপাশি, সার্বজনীন, আরোগ্য প্রভৃতি রচনার মধ্যেই প্রথম এই অনুপুঙ্খ পারিবারিক মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যেতে থাকে। তারপর সেটা বাড়তে বাড়তে মৃত্যুর (১৯৫৬) কাছাকাছি সময়ে এসে আরও জোরালো হয়ে ওঠে। জীবনের শেষের বছরগুলিতে শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও মানিক বাঙালী সমাজের যে স্তর থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন সেই

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার রীতিনীতি ধারাধরন প্রশ্ন-সমস্যা ইত্যাদির সঙ্গে কী গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন এই উপন্যাসগুলি পড়লে সে কথা নিঃসংশয়ে বোঝা যায়।

স্পষ্টতই মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের বিষয় হিসাবে খুব উচ্চাঙ্গের নয়। তার মধ্যে কল্পনার মহত্ত্ব, চিন্তার বিরাটত্ব আশা করাই অন্যায়। কায়ক্লেশে বেঁচেবর্তে থাকার লড়াইয়ে সংসার এবং পরিবারের মানুষগুলির পারস্পরিক মান-অভিমান রাগ-অনুরাগ ছোটখাট ঈর্ষা-বিদ্বেষ প্রভৃতি অনুভবের চিত্র যে-উপন্যাস সমূহের মূল উপজীব্য, সেইসব রচনা কাল্পনিকতার উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকবে কিংবা মনন-অনুভূতির তুঙ্গসীমা স্পর্শ করবে এমনটা মোটেই আশা করা যায় না। কিন্তু বাঙালী জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা, ভাঙন, ক্রমাবতরণ বোঝাতে এর চেয়ে ভাল বিষয় আর কী হতে পারে? বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার অবক্ষয় তথা ফাঁকি ও মেকি ফুটিয়ে তোলার জন্য মানিক শেষ বয়সে একাধিক ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। আলোচ্য উপন্যাসত্রয়ীকে সেই পর্যায়েরই শেষ তিন রচনা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এক সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার পরাধীন প্রেম উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। প্রমোদ এই পরিবারের কর্তা। তার দুই ছেলে অনিল ও সুনীল। তিন মেয়ে মুকুল, বকুল ও সুমতি। প্রথমে মেয়েদের কথা বলি।

বড় মেয়ে মুকুলের স্বামী অপূর্ব। অপূর্ব মগুপ, অত্যাচারী, অপিচ সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। মিথ্যা সন্দেহে মুকুলকে অভিযুক্ত করলে মুকুল তার প্রতিবাদে মাতাল স্বামীকে ছেড়ে বাপের বাড়ী চলে আসে। সেই থেকে মুকুল বাপের বাড়ীতেই রয়ে যায়। অপূর্ব এই সুযোগে আরেকটি বিয়ে করে পত্নী-নির্যাতনের নয়া ক্ষেত্র রচনা করে।

কিন্তু মুকুলের ভাই অনিল খুবই দায়িত্বশীল যুবক ও বোনের প্রতি অত্যন্ত কর্তব্যসচেতন। সে ব্যাপারটাকে এত সহজে ছেড়ে দেয় না। সে অপূর্বর বাড়ী গিয়ে অপূর্বকে শাসায়। অনিলের শাসানিতে ভয় পেয়ে অপূর্ব মুকুলকে নিয়মিত খোরপোষ পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়। অনিলের জোরের কাছে অপূর্ব কেঁচো হয়ে যায়।

মুকুলের পরের বোন বকুল। দুর্ভাগ্যক্রমে বকুল বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই বিধবা হয়। সতীশের মৃত্যুর পর বকুল স্বামীর সংসার ছেড়ে বাপমায়ের সংসারে এসে আশ্রয় নেয়। প্রতিবেশী বিনয় খুব ভাল ছেলে, ছোটবেলা থেকেই বকুলদের চেনে। বকুলদের বাড়ীতে তার অবারিত দ্বার। কোনদিন বকুলকে

সে স্নেহ ছাড়া ভিন্ন কোন দৃষ্টিতে দেখেনি, কিন্তু বকুলের নবরূপান্তরের পর বিনয়ের মধ্যে কেমন যেন নতুন অনুভূতি জন্ম নেয়। সে বকুলের প্রতি এক অভাবিতপূর্ব আকর্ষণ বোধ করে। বকুলের প্রতি তার অন্তরে প্রেমের সঞ্চার হয়। সে বিধবা বকুলকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দেয়। বকুল প্রথমটা তার বিনয়দার এই প্রস্তাবে হকচকিয়ে যায় পরে রাজী হয়। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু পরিবারে বিধবার পুনর্বিবাহের অনেক বাধা। বকুলের দিদি মুকুল এই বিবাহে প্রচণ্ড আপত্তি তোলে।

মুকুল নিজে স্বামী পরিত্যক্তা কিংবা স্বামী পরিত্যাগকারিণী। তার তো বোনের এ বিয়েতে আপত্তি জানানোর কথা নয়। কিন্তু দীর্ঘকালের অভ্যস্ত সংস্কারের হাতে ধরা জীব ও শিক্ষার আলোক বঞ্চিতা নারী সহজে কি প্রথার দাসত্ব অতিক্রম করতে পারে? সে তার ছোট বোন বিধবা বকুলের বিনয়ের সঙ্গে পুনর্বিবাহের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং প্রতিবাদের নামে বাড়ীতে একটা হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধিয়ে বসে। শুধু তাই নয়, সে বকুলের শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে তাদের এই বিয়ে ভেঙে দেবার জন্য প্ররোচিত করে। এই সুযোগে সে নিজের শ্বশুরবাড়ীতেও যায়। তার এককালীন অবিচারকারী স্বামীর সঙ্গে এক দফা তীর্থ ভ্রমণও সেরে আসে মাস খানেকের জন্য। কিন্তু ঘরে দ্বিতীয়া স্ত্রী থাকায় অপূর্ব আর তাকে গ্রহণ করে না, মুকুল বাপের বাড়ী ফিরে আসে।

এদিকে বকুলেরও কেমন ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সে প্রথমে বিনয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল কিন্তু এখন হিন্দু সমাজের প্রচলিত সংস্কারের প্রভাবে পেছিয়ে যায়। মৃত স্বামী সতীশের স্মৃতির ভূত তার কাঁধে চেপে বসে। তার উপর আরেকটি ঘটনায় বকুলের মনের গতি ঘুরে যায়। সতীশদের যৌথ পরিবারে সতীশের অংশ নিঃসন্তান সতীশ তার স্ত্রী বকুলের নামেই লিখে রেখে গেছে জানা যায়। বকুল শ্বশুরবাড়ী গিয়ে স্বামীর ভাগের দখল নেয়। হতাশায় বিনয় সস্তা মদ ও মেয়েমানুষে আসক্ত হয়ে ওঠে, শেষে পেটের আলসার ঘটিয়ে বসে।

অনিল আর কান্তা একই সঙ্গে পড়ে। দুজনেই অতিশয় মেধাবী। তবে অনিলের মেধা প্রখরতর। কিন্তু কান্তাকে পরীক্ষায় ফার্স্ট করিয়ে দেবার তাগিদে অনিল ইচ্ছা করে তলায় থাকার স্বাধীনতা বেছে নেয়। সুতরাং দুইয়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সুতীব্র এটা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তাদের মিলনে দুস্তর বাধা। কারণ কান্তা বিধবা। স্বামী অঘোর ছিল মদ্যপ,

অত্যাচারী। প্রায়ই তাকে মারধোর করত। একদিন অত্যাচার সইতে না পেরে কান্তা অঘোরকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে এক কাপড়ে বাপের বাড়ী চলে আসে। সেই থেকে সে কুমারীর মত জীবন-যাপন করে। কিন্তু অঘোরের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে অনিলের ভালোবাসাকে প্রশ্রয় দেয় না।

কান্তা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিবেচনাশীলা। সবদিকে তার সমান চোখ ও কর্তব্যপরায়ণতা। অনিল আর কান্তা যেন একে অপরের জন্য তৈরী হয়েছিল এমনি তাদের মনের ও স্বভাবের মিল। নানান সাংসারিক প্রতিবন্ধকতার জন্য তাদের বিয়েটা কেবলই পেছিয়ে যেতে থাকে। এদিকে বাধার উপরে বাধা। অনিলের ভাই সুনীল পরীক্ষায় পাশ করতে না পেরে আত্মঘাতী হবার সংকল্প করে। কান্তা সময় থাকতে টের পেয়ে তাকে আত্মহত্যা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে। কান্তার পরামর্শে সুনীল কিছুদিন দেশান্তরী হয়। বাইরে ঘুরে আসবার ফলে সুনীলের মনোভাবের বদল হয়, সে ধাতস্থ হয়।

অনিলদের সংসারের পাশাপাশি মানিক এই উপন্যাসে আরেকটি সংসারের চিত্র এঁকেছেন। হরিপ্রসন্নর সংসার। হরিপ্রসন্নর কন্যা উমাকে অজিত ভালবাসে। হরিপ্রসন্নর সংসারের অভাব-অনটনের কারণে উমার পড়ার খরচ অজিতই যোগায়। তাদের দুজনার মধ্যে বিয়ে হবে এ একরকম ঠিকই ছিল কিন্তু অজিত শেষ অবধি পিছিয়ে যায় এবং অন্যত্র বিয়ে করে। কিন্তু উমার প্রতি দায়িত্ব পালনের অপরাধবোধের তাড়নায় বন্ধু চন্দ্রনাথকে বলে তার আপিসে উমার চাকরি করিয়ে দেয়। উমার আনন্দের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল কিন্তু বিবাহিতা মহিলাকে চাকরিতে রাখার নিয়ম নেই চন্দ্রনাথ একথা জানিয়ে দেবার পর উমা সেই বিয়ে ভেঙ্গে দেয় এবং সংসারের প্রয়োজনে চাকরিটি বজায় রাখাই সাব্যস্ত করে।

উমার ছোট ভাই সমীর তোতলা রোগা বেঁটে-খাটো ছায়ছোট্ট মানুষ কিন্তু জেদী ও আত্মমর্যাদা-পরায়ণ। বিড়ি বেঁধে উপার্জন করে সে নিজের হাত-খরচা চালায় এবং সংসারকেও কিছু কিছু সাহায্য করে। সমীরের প্রতি মুকুল বকুলের ছোটবোন সুমতির আন্তরিক টান। দুইয়ের ভালবাসা বিবাহে পরিণতি লাভ করে।

পাঁচী অনিলদের বাড়ীর ঝিয়ের মেয়ে। অনিলদের আপিসের পিওন কার্তিকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়—অনিলই উদ্যোগী হয়ে এই বিয়ে দেওয়ায়। সাংসারিক কলহের পরিণামে পাঁচী বিষ খায়, কিন্তু অনিলের হস্তক্ষেপে সময়োচিত

চিকিৎসায় পাঁটী বেঁচে যায়। পরে সংসারের সাশ্রয়ের তাগিদে বাড়তি রোজগারের আশায় নিজেও ঝিগিরিতে লাগে।

পরাধীন প্রেম উপন্যাসের নামের মধ্যেই তার তাৎপর্য নিহিত আছে। এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে, নরনারীর প্রেম পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিতান্ত অধীন। ইচ্ছা করলেই প্রেমকে বিবাহে সার্থক করা যায় না ; পদে পদে সাংসারিক অর্থনৈতিক সামাজিক বাধা ও বিপত্তি। রোমান্টিক প্রেমের মধুর ধারণাটিকে এই বইতে মানিকের বাস্তববাদী নির্মম শিল্পদৃষ্টি খানখান করে ভেঙে দিয়েছে। প্রেমকে সফল করে তুলতে মানুষের নিজের মধ্যেই বহুতর জটিলতার জট থাকে —এই জটের মূলে থাকে প্রথার পশ্চাৎটান, লোকনিন্দার অহেতুক ভীতি, প্রায়শই আর্থিক অনৈশ্চিত্যের পটভূমিকা। রূঢ় বাস্তবকে অস্বীকার করে স্বপ্নে রঙীন হওয়ার পথ এ সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রুদ্ধ। অলীক কুহকের হাতছানিতে ভুলে জীবনকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

বিনয়ের উপলব্ধি : "আরও অনেক বছর বয়স না বাড়লে, আরও অনেক অভিজ্ঞতার শিক্ষা সঞ্চয় না করলে, জীবনের সেরা বছরগুলি জানতে বুঝতে ব্যয় না করলে, তার পক্ষে বোঝাই সম্ভব নয় যে বকুলকে বিয়ে করে বকুলকে সুখী করতে পারবে কিনা, নিজে সুখী হতে পারবে কিনা।"

"কেন এই অনিয়ম ? জীবন্ত মানুষের পক্ষে জীবনবিরোধী এই নিয়ম ?"

পূর্বেই বলেছি, মাশুল মানিকের জীবিত-কালের প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাস। এই উপন্যাসের মধ্যে চালচলন উপন্যাসের কিছু চরিত্র (মিলনী অনাদি সুনীল) ও ঘটনার একেবারে হুবহু ছাপ এসে গেছে। সম্ভবতঃ মানিক তাঁর শেষ বয়সের অসুস্থতা জনিত বিভ্রম বশে এই ভুলটি ঘটিয়ে বসেছেন। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আছে রাণী-সাধন মমতা-লোকেশ, নমিতা-বরেন, নবেন্দু-কৃষ্ণা, অম্লান-অবলা-রসময়-বালা প্রভৃতি। ডক্টর চক্রবর্তী মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক, বিনোদিনী ধাত্রী-বিশেষজ্ঞা।

এই বইয়েও পরাধীন প্রেম উপন্যাসের মত প্রেম ভালবাসার চিত্র আছে, তবে কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া, অসংলগ্ন। অসুস্থ অবস্থায় লেখা, তাই বোধহয় স্থানে-স্থানে ঘটনার গতি হঠাৎ হঠাৎ থেমে গেছে, তারপর আর সেই ঘটনার থেই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

গয়লানীমেয়ে বালা চরিত্রটি সবলা গ্রাম্য বালিকার একটি সুন্দর চিত্র। ধাত্রীবিশেষজ্ঞা বিনোদিনীর বাইরেটা রুক্ষ কিন্তু ভিতরে মায়া-মমতা এখনও

মরে যায়নি। জীবনের পোড় খাওয়া অভিজ্ঞতার প্রহারে স্বভাবটা কাঠিন্য ও কোমলতায় একটা অদ্ভুত মিশ্রণে দাঁড়িয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক ডঃ চক্রবর্তী মানিকের মনোবিকলন প্রীতির সজীব রূপ।

এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির আচরণ ভুলে ভরা। আর তাই তাদের ভুলের মাশুলও গুণতে হয় নানাভাবে নানা আকারে। রাণী ও সাধনের ভাব-ভালবাসা বিবাহে পরিণতি লাভ করবে এমনটা ওরা আশা করেছিল কিন্তু তাদের পরিবারের লোকদের ও বিষয়ে কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত না হওয়ায় দুজনে আফিম খেয়ে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবে ঠিক করেছিল। কিশোর-কিশোরীর রোমাণ্টিক ধরনের প্রেমের ব্যামো আর কি! কিন্তু কার্যত আফিম খেতে গিয়ে রাণী খেল খয়েরের বড়ি, আর সাধনের আফিম খেয়ে মর মর অবস্থা। সাধন সেরে উঠে ভুল করে ভাবল রাণী তাকে বিষ খাইয়ে মেরে নিজে বাঁচতে চেয়েছিল, সেই থেকে ওদের আপাতত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। পরে অবশ্য গোল মিটে যায়।

নমিতার কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্বা হওয়ার কারণ বরেন। কিন্তু বরেন নমিতাকে বিয়ে করল না, উল্টে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। নমিতা অবশ্য সামলে উঠল কিন্তু বরেনকে জীবনে ক্ষমা করল না।

রসময় মাতাল অবস্থায় উত্তেজনার মাথায় হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রী অবলাকে লাথি মারে। ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে অবলা আত্মহত্যা করে।

এইভাবে ভুলের খেসারত জমা হতেই থাকে বিভিন্ন জুটির জীবনে। মানিকের দার্শনিকজনোচিত মন্তব্য: "একটা ভুল করলে তার মাশুল দিতে হয়। এটা সংসারে অতি সাধারণ নিয়ম···মাশুল গোণাই যেন মূল নীতি জীবনযাত্রার। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে বা প্রৌঢ় বয়সে শুধু নয়। বার্ধক্যে পর্যন্ত।···প্রত্যেক জীবনের আদি এবং অন্ত মিলিয়ে প্রত্যেক জীবনের হিসাব-নিকাশ। তার মধ্যে ফাঁকি নেই।···তবে কিনা মানুষ কখনো হার মানে না। ভুল সামলে নতুন পথে যাত্রা শুরু করে।" (মাশুল, প্রথম অধ্যায়)

উপন্যাসটির শিথিল বাঁধুনির কথা আগেই বলেছি। কোন আখ্যায়িকাই তার ন্যায়সংগত পরিণতিতে সমাপ্ত নয়, মাঝপথে ভগ্ন। আর উপন্যাসটির বর্ণনরীতি বড্ডবেশী খুঁটিনাটিপরায়ণ। মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার এত বেশী তুচ্ছ ডিটেলের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে এক এক সময় পাঠক্রিয়ায় হাঁফ ধরে যায়। পাতে পড়া মাছের টুকরোর বড়-ছোট কিংবা দুধের বরাদ্দের এক ছটাক কি আধ পো বাড়া-কমা নিয়ে পরিবারের মানুষজনদের মধ্যে মন-কষাকষি বাস্তব

চিত্রণ হলেও শিল্পসম্মত বাস্তবচিত্রণ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। এই জাতীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় স্পষ্টতই কাহিনী শিল্পের উদার পটভূমি থেকে স্খলিত হয়ে অকিঞ্চিৎকরত্বের জগতে প্রবেশ করে তার রস হারিয়ে ফেলে।

মনে হয় জীবনসংশয় দুরন্ত পীড়ার প্রকোপে সেই সময়ে মানিকের দৃষ্টি থেকে বৃহত্তর সমাজের অর্থনৈতিক বাঁচার লড়াইয়ের ভাবনা-চিন্তা ফিকে হয়ে এসেছিল এবং তাঁর তদানীন্তন ঝাপসা চোখে তুচ্ছ পারিবারিক গৃহকোণ বড্ডবেশী প্রাধান্য পেয়েছিল। এটা সঠিক শিল্পদৃষ্টি নয়। কিন্তু কী হলে ভাল হত কী হওয়া ভাল হয়নি এই নিয়ে বিপর্যস্ত-মানস অসুস্থ লেখকের সঙ্গে তো বিবাদ করা চলে না। মানিকের গোটা জীবনের প্রতিভার দান স্মরণ করে অন্তিম পর্যায়ে তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যে প্রকাশিত প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান খুবই দুর্বল উপন্যাস। যেমন-তেমন করে একটা কাহিনী খাড়া করার তাগিদ ছাড়া এই উপন্যাস রচনার পিছনে আর কোন মহত্তর তাগিদ আছে বলে মনে হয় না।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রামনাথ দেবশর্মার পুত্র প্রাণেশ্বর। মা সরলা, সরলার সই মণিমালা। প্রাণেশ্বরের জন্মকালে সরলা খুবই কষ্ট পেয়েছিল। পাশের বেডের প্রসূতি মণিমালার যত্নে ও সেবায় প্রাণেশ্বরের প্রাণ রক্ষা পায়। সেই থেকে দুই পরিবারে গভীর আত্মীয়তা। প্রাণেশ্বর মণিমালাকে মণিমা বলে ডাকে। মণিমালার স্বামী সমর. মেয়ে ইন্দ্রানী, ভাই চপল।

বাপের অকালমৃত্যুতে প্রাণেশ্বর মেডিকেল পড়ায় ক্ষান্তি দিয়ে শ্যামাদাস কাকুর সঙ্গে মিলে ওষুধের দোকান দেয়। ইন্দ্রানী নাচের স্কুলে ভর্তি হয়, মামা চপল (এক বিপর্যস্ত হতাশ যুবক) ইন্দ্রানীকে নাচের স্কুলে দিয়ে ও নিয়ে আসার কালে ওই স্কুলের সহ শিক্ষার্থিনী বড়লোকের মেয়ে মৃদুলার সঙ্গে পরিচিত হয় ও শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করে। ইন্দ্রানীর জীবন উদ্দেশ্যহীনভাবে ভাসতে থাকে।

এই উপন্যাস লেখার কী সার্থকতা বোঝা যায় না। না আছে সুগ্রথিত প্লট, না আছে চরিত্রগুলির যথামাপে পরিস্ফুটন। অবশ্য ব্যাধিতাড়িত কলমে এর চেয়ে কীই বা বেশী আশা করা যায়? ওই অবস্থায় মানিক যে লিখতে পেরেছেন, লেখা থেকে বিশ্রাম নেননি—সেইটাই এক-এক সময় বড় আশ্চর্য মনে হয়।

একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিহ্ন (জানুয়ারি ১৯৪৭) একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস এটি দুই অর্থে। প্রথমতঃ, এই উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা একটি ঐতিহাসিক সংঘটনকে কেন্দ্র করে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমানসের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিক্ষোভ ও ক্রোধ ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারির কলকাতায় 'রসিদ আলি দিবসকে' উপলক্ষ্য করে যে-প্রচণ্ড বিক্রমে ফেটে পড়েছিল তারই অনবদ্য শিল্পরূপ হলো এই স্বল্পায়তন উপন্যাসটি। ভারতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি ঘটনাকে কাহিনীর বিষয়ীভূত করে মানিক বোধহয় ওই রচনার আগে বা পরে আর কোন উপন্যাস প্রণয়ন করেননি। তেভাগা আন্দোলন নিয়ে তাঁর একাধিক সার্থক ছোটগল্প আছে, এই খাতে তাঁর সর্বাধিক পরিচিত রচনার নাম ছোট বকুলপুরের যাত্রী ; গ্রামের কৃষক জাগরণ নিয়েও আছে একাধিক স্বরচিত গল্প, যেমন হারানের নাতজামাই, পেটব্যথা প্রভৃতি। কিন্তু একটি রাজনৈতিক সংঘটনকে কাহিনীর কেন্দ্রীয় বিষয়ের মর্যাদা দিয়ে তাকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনার নজির বোধকরি তাঁর লেখনীতে এই প্রথম ও এই শেষ।

সেইদিক থেকে চিহ্ন উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা সম্ভবতঃ অসঙ্গত বা অযৌক্তিক মনে করা চলে না। অবশ্য আকাডেমিক আলোচনা-সমালোচনার পুঁথিতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনেক গালভরা সংজ্ঞা দেওয়া আছে—ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে কী বোঝায় তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে চুলচেরা বিচারের অন্ত নেই। ওই সকল বিন্যায়তনিক অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিহ্ন উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের কোঠায় ফেলা যাবে না। কিন্তু তাতে কী? প্রথাবদ্ধ, প্রায়শঃ গতানুগতিক, সমালোচনার অনুশাসনকে মান্য করে চিরটা কাল বাঁধা সড়ক বেয়ে চলতে হবে তার কোন কথা নেই। নতুন সাহিত্যের বিচারণায় নতুন মূল্যমানই প্রত্যাশিত। মানিকের সাহিত্য নবসৃজনমূলক সাহিত্য, কাজেই এই সাহিত্যের সম্বিৎসায় নব্যবিচারের মাপকাঠি সর্বথা প্রযুজ্য।

দ্বিতীয়তঃ, নিতান্ত স্বল্পায়তন হলেও চিহ্ন বইখানি কিন্তু মোটেই স্বল্পমূল্যের বই নয়। বাংলার বিপ্লবী সাহিত্যে এ বইখানির একটি স্বকীয় স্থান আছে। বাংলার তরুণ মনের ভিতর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রোষ সঞ্চারে, যুবশক্তিকে সংগ্রামী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধকরণে এই উপন্যাসখানির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা কোনক্রমেই

অস্বীকার করা যায় না। সেইদিক থেকে বইটির প্রভাব পাঠক সাধারণের উপর অমিতসম্ভাবনাযুক্ত। ক্ষুদ্রাকার হয়েও বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে চিহ্ন একটি স্মরণীয় অবদান। উপন্যাসটিকে এই অর্থেও 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দেওয়া যায় অনায়াসে।

অর্থাৎ, বইটি বিষয়বস্তুগতভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্তির যোগ্য ; প্রভাবের দিক দিয়েও ঐতিহাসিক পরিণাম সম্ভাবনাপূর্ণ। নিবন্ধের শিরোনামে এই দুই অর্থেই উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা হয়েছে।

চল্লিশের দশক বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে উত্তাল-উতরোল ঘটনাবর্তের কাল। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ, নিষ্প্রদীপ, জাপানী হামলা, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনায় বিপরীতমুখী দাবী-দাওয়ার টানাপোড়েনজনিত রাষ্ট্রিক অস্থিরতা, বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধের অগ্রগতিতে বিশ্বস্থিতির টালমাটাল অবস্থা, আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতের অভিমুখে অব্যাহত ক্রমিক অভিযান, যুদ্ধশেষ, যুদ্ধশেষে দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ বন্দীদের বিচার প্রহসন, কলকাতায় যে-কোন আলোড়ন-বিলোড়নকে ঘিরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি—সব মিলিয়ে সে-এক আথাল-পাথাল ব্যাপার। ওইসব বিক্ষোভ-সংক্ষোভ-সংঘাত-সংবর্তের সম্মিলিত পরিণাম-ফলের সূচিমুখে উদগত একটি বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে কলকাতা শহর যেন আবার নতুন করে ফেটে পড়লো ১৯৪৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি—সে ঘটনাটি হলো "রসিদ আলি দিবস"। তার আগে ১৯৪৫ সালের ২১শে নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় ছাত্রদের যে-সমাবেশ হয় তাতে পুলিশ গুলি চালিয়ে দুটি ছাত্রের মৃত্যু ঘটায়। তারই মাস তিনেক পরে সংঘটিত রসিদ আলি দিবসের ভূমি ওইভাবে প্রস্তুত হয়। রসিদ আলি দিবসে কলকাতার হিন্দু ও মুশলিম ছাত্ররা আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন আব্দুর রসিদের ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ছাত্র ফেডারেশন ও মুশলিম ছাত্র লীগ একযোগে এই বিক্ষোভ-সমাবেশের নেতৃত্ব দেয়। দেখাদেখি অন্যান্য শ্রেণীর যুবারাও এই মিছিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই উপলক্ষ্যে কলকাতায় দুদিন ধরে পুলিশের বেপরোয়া লাঠি ও গুলি চালনায় ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তরুণেরা পুলিশের গুলির মুখে আদৌ পিছু হটে না—ধর্মতলার রাস্তা শহীদের রক্তে লাল হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই ছাত্রদের মিলিত ভূমিকায় এই আত্মদান

সত্যিকারের অসাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে। কলকাতার বুকে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

এরই এক সপ্তাহ বাদে বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহ। সেও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রতিরোধের এক অসামান্য বৈপ্লবিক অভিব্যক্তি। ভাবতে অবাক্ লাগে এরকম সর্বব্যাপী সাম্প্রদায়িক মিলনোচ্ছ্বাসের পৃষ্ঠভূমিতে তারই কয়েক মাস বাদে কলকাতার বুকে চরম ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটতে পারলো। আমরা ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের কলকাতার সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণের কথা বলছি। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কূটচক্রান্তের এ এক সাংঘাতিক পরিণতি।

রসিদ আলি দিবসের ঘটনা এইরূপ। ক্যাপ্টেন আবদুর রসিদের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার উত্তাল-উদ্বেল চেহারা। প্রতিবাদ জানাবার জন্য ওইদিন কলকাতার সমগ্র ছাত্র ও যুব সমাজ যেন একটি মানুষে সংহত হয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অনতিদূরস্থ ধর্মতলা স্ট্রীটে ভেঙে পড়লো। সান্ধ্য কলেজগুলির ছাত্রেরা খবর পেয়ে কলেজ ছেড়ে দলে দলে এসে প্রতিবাদ জমায়েতকে স্ফীত করে তুললো। পুলিশ ছাত্রমিছিলের অগ্রগতিকে বাধা দেবার জন্য ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর ব্যারিকেড রচনা করলো। ছাত্রেরা একটুও বিচলিত না হয়ে সেখানেই বসে পড়লো। চললো সারা সন্ধ্যা ও সারারাত ব্যাপী ওই রাস্তায় ছাত্র-যুবাদের অবিচল অবস্থান। পুলিশে-ছাত্রদলে ধৈর্যের অন্তহীন পরীক্ষা। এক সময়ে পুলিশ অধৈর্য হয়ে ছাত্র জমায়েতের উপর গুলি চালালো। মারা গেল একটি ছাত্র। কিন্তু তাতেও ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে পারা গেল না। ছাত্রেরা মৃতদেহ আগলে ঠায় সেখানে বসে রইল। যুবজনতার সুশৃঙ্খল সংহতি ও অকুতোভয়তার এক অভাবনীয় উজ্জ্বল উদাহরণ।

পরদিন শহরের অধিবাসীদের উপর এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হলো অসামান্য। ভোর হতে না হতেই দলে দলে কাতারে কাতারে মানুষ ধর্মতলার অভিমুখে ছুটলো। আশেপাশে রাস্তায় অলিগলিতে পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের বাধতে লাগলো খণ্ডখণ্ড সংঘর্ষ—যাকে বলে 'বেড়াল-ইঁদুর লড়াই'। পুলিশের লাঠি-সঙ্গীন-কাঁদানে গুলির জবাবে জনগণের পক্ষ থেকে চললো ইঁট-পাটকেলের মরিয়া শিলাবৃষ্টি। কিন্তু ধর্মতলা স্ট্রীটের জমায়েতী অবস্থান কিন্তু সর্বাবস্থায় অটুট ছিল। পথ-অবরোধ একটুক্ষণের জন্যও শিথিল হয়নি। অবশেষে ঐক্যবদ্ধ স্ফীতকলেবর জনতার প্রতিবাদের রুদ্রমূর্তি দেখে পুলিশ রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হলো। তারা একটা সময়ে ব্যারিকেড তুলে নিল। অবরোধ-মুক্তির পর সেদিন তিনলক্ষ মানুষের এক মিছিল কলকাতা শহর পরিক্রমা করেছিল।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিরই পটভূমিকায় লেখা চিহ্ন উপন্যাস। তবে সচরাচর-প্রচলিত উপন্যাসের যেমন একটি কেন্দ্রীয় প্লট থাকে, থাকে নায়ক-নায়িকা, থাকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পার্শ্ব-চরিত্র, এই উপন্যাসে তেমন কিছু নেই। বিক্ষোভ-মিছিলে সমাগত কিংবা যোগদানমুখী নানা বয়সের নানা মানুষকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কলেবর রচিত হয়েছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলি একাধিক জটলায় কেন্দ্রীভূত অথবা বিক্ষিপ্ত। বেশীর ভাগই তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, তবে মধ্যবয়সীও কেউ কেউ আছেন। শহরের রাস্তায় বিচরমাণ নরনারীর চলিষ্ণু গতির দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এই উপন্যাসে অগ্রগতির বেগ।

উপন্যাস রচনায় এ এক অভিনব ধরনের পরীক্ষা। বাংলা ভাষায় এর তেমন কোন পূর্ব-নজির নেই। মানিক নিজেই তাঁর এই বইয়ের আঙ্গিক সম্বন্ধে তাঁর লেখকের কথায় লিখেছেন—"বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কিনা আমার জানা নেই। ঐ ধরনের কাহিনী, যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত গতিতে ঘটে চলে এভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি।"

কাহিনীর সারাংশ এইরূপ :

গাঁয়ের ছেলে গণেশ। লেখাপড়া বেশী শেখেনি। জীবিকার দায়ে সে শহরে এসে দাশগুপ্তের দোকানে কাজ নিয়েছিল। দাশগুপ্ত একজন পয়লা নম্বরের চোরাই চালানকারী—গোপনে মদ ও অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তু পাচার করার ব্যবসা করে। গণেশ রোজকারমত তার কাজে বেরিয়েছিল, ঘুরতে ঘুরতে ধর্মতলায় ছাত্র-জমায়েতের মধ্যে এসে পড়ে। রাজনীতি সে জানত না, এসব বোঝবার মত তার শিক্ষা ছিল না। কিন্তু সে ছাত্রদের মনোবল দেখে অবাক্ হয়ে গেল। বন্দুকধারী পুলিশ সামনে মোতায়েন দেখেও কেউ একচুল জায়গা থেকে নড়ছে না, ঠাঁই বদলাচ্ছে না—এ তার মামুলী জীবনে এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। উত্তেজনার রোমাঞ্চে মালিকের কাজ ফেলে রেখে গণেশ ছাত্রদের মিছিলে ভিড়ে পড়লো। সেই মিছিলে ছাত্ররা অগ্রবর্তী হলেও শুধু ছাত্ররাই ছিল না, ছিল সকল শ্রেণীর জনগণ, ছিল খেটে-খাওয়া মেহনতী স্তরের বহু তরুণ ও যুবা। গণেশের মতই আছে নারায়ণ, ওসমান, রসুল, আবদুল, শিবনাথ, আছে নিতান্ত স্কুলের ছাত্র রজত, আছে কলেজপড়ুয়া হেমন্ত ও সীতা আর অজয়।

হেমন্ত মার্কা-মারা ভাল ছেলে। পড়াশুনা নিয়েই সব সময় থাকে

পারতপক্ষে রাজনীতির ভিতর যেতে চায় না, "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ" এই নীতিকেই জীবনের সার বলে জেনেছে। তার এই রাজনীতিবিমুখতা কতকটা তার নিজের কারণে অনেকটাই তার মায়ের স্নেহান্ধতা বশতঃ। ছেলে না রাজনীতির দলে মিশে বিগড়ে যায় আর লেখাপড়া গোল্লায় দেয় এই তার মায়ের সর্বক্ষণের ভয়। হেমন্ত মায়ের নিতান্ত অনুগত বাধ্য সন্তান। এই নিয়ে হেমন্তের সহপাঠিনী সীতা "মায়ের আঁচল ধরা ছেলে" বলে হেমন্তকে প্রায়ই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং পুরনো সংস্কারের নিগড় ভেঙে ফেলে চোখ-কান মেলে নতুন পৃথিবীর দিকে তাকাবার জন্য তার ভালবাসার মানুষটিকে পরামর্শ দেয়। কিন্তু সীতার যে-মনের জোর আছে, হেমন্তের সে-মনের জোর নেই। পারিবারিক পেছুটানের কারণে তার বুদ্ধিও কমবেশী অস্বচ্ছ।

কিন্তু এমন যে হেমন্ত, সেও আজ জনপ্রবাহের উদ্বেল আলোড়নের মুখে পড়ে তার পুরনো দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রাজনৈতিক মিছিলের সামিল হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সে অনুভব করছে প্রতিবাদের দৃঢ়তা তার মধ্যে ক্রমশঃ সংক্রামিত হচ্ছে। সীতা ভিড়ের মধ্যে ছিল। জনসমাবেশের মধ্যে হেমন্তকে অগ্রবর্তী দেখে সীতার মুখ উজ্জ্বল হয়, তার বুক তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

জনতা ক্রমে স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে ওঠে। পুলিশ এক সময়ে গুলি চালায়। গুলিতে গণেশ মারা যায়। রসুলের হাতে গুলি লাগে। হাসপাতালে তার একটি হাত কেটে বাদ দিতে হয়। উপরন্তু তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে ওই অবস্থাতেই হাসপাতালের বেড থেকে পালিয়ে শিয়ালদার দিকের বস্তিতে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে। মা আমিনা ছেলের কাটা হাত দেখে চীৎকার করে ওঠে। কিন্তু খানিকটা আত্মস্থ হওয়ার পর মায়ের কেবলই মনে হতে থাকে, "দেশের সব ছেলেই তার রসুলের মত—অন্য কোন পথ তাদের নেই।" আবদুল এসে ভোর রাতে রসুলকে আবার হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আসে।

অক্ষয় রোজকার মত তার নিত্যকার সান্ধ্য নেশার সন্ধানে ধর্মতলার মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। সে পুলিসের গুলির মুখে ছাত্র-যুবাদের অকুতোভয়ে বুক পেতে দেবার দৃশ্য দেখে চমৎকৃত হয়। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। নেশার শখ তার মিটে যায়। মদের দোকানের পৈঠায় পা দিয়েও সে মদ না খেয়ে শুধু-মুখে বাড়ী ফিরে আসে। সে তার স্ত্রী সুধাকে ধর্মতলা স্ট্রীটের ছাত্রজনতার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে যতই বলে সে আজ মদ ছোঁয়নি, তার স্ত্রী কিছুতেই সে-কথা বিশ্বাস করতে চায় না। সুধার জীবনে এমনতর অভিজ্ঞতা

অকল্পনীয়—তার স্বামী মদ না খেয়ে বাড়ী ফিরেছে এমন রাত সে স্মরণ করতে পারে না।

কিন্তু অক্ষয় সত্যিই সে রাতে মদ খায়নি। আর হয়ত কোনদিনই খাবে না। যদি-বা কখনও দু-একদিন মদের গেলাসে চুমুক দেয় সে দেবে ক্ষণিকের দুর্বলতায়, কিন্তু সেটাও দু-একবারের বেশী আর খাবে না, কারণ "ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীয়ন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে—গেঁজানো রক্ত।"

বাস্তবিক অক্ষয়ের মনোভাবের এই পরিবর্তন আকস্মিক হলেও মৌলিক। এ যেন অক্ষয়ের বকলমে মানিকেরই নিজের জীবনদর্শন। অক্ষয় ভাবে, "জগতের যাবতীয় সমস্যার মর্ম যেন তার আজ মদ খাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও না খাওয়ার এবং এ নেশা যেভাবেই হোক ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞার বিদ্রোহে অকস্মাৎ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে জীবনে—কঠিন, কঠিন এ কাজ।"

(ফ্রয়েডবাদী অপবিজ্ঞান থেকে মার্কসবাদী খাঁটি বিজ্ঞানে উত্তরিত হওয়ার সংকল্পের দৃঢ়তার অভিব্যঞ্জনা একটু চেষ্টা করলে এই লাইনগুলির ভিতর খুঁজে পাওয়া যায় না কি? কারণ সত্যিকার বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ফ্রয়েডবাদ একটা নেশার আচ্ছন্নতা ছাড়া আর কি? অচিন্ত্যকুমারের পরিভাষায় যিনি ছিলেন "কল্লোলের কুলবর্ধন" এবং বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় "বিলম্বিত কল্লোলপন্থী", সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে কল্লোল-আশ্রিত ফ্রয়েডীয় নেশার আবেশ কাটিয়ে ওঠাই ছিল সবচাইতে কঠিন কাজ। – লেখক)

যাই হোক, কাহিনীর সূত্রে আবার ফিরে আসি।

পরদিন গুলি চালানোর প্রতিবাদে সমস্ত শহর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হরতাল আর সাধারণ ধর্মঘট পালনের ডাক দেওয়া হয়। অগণিত মানুষ তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। হেমন্ত আজকের মিছিলেও যোগ দেয়। গতকাল সে সামান্য আহত হলেও সে-আঘাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি বরং অধিকতর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আজকের মিছিলে যোগ দিয়েছে। সে অনুভব করে, "পালিয়ে পালিয়ে এড়িয়ে চলার দিন তার পক্ষে ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কী করতে হবে তাকে আগামী দিনগুলিতে, ঠিকমত তার জানা নেই।"

এই প্রশ্ন শুধু ১৯৪৬ সালের কলেজপড়ুয়া ছাত্র হেমন্তের নয়, আজকের দিনে সকলের। যারাই গতানুগতিক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় নয়া সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তাদের সামনে এ এক নিত্য-বিরাজমান জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

হেমন্তের এই পরিবর্তন দেখে সীতা এই ভেবে খুশী হয়, হেমন্তের জীবন থেকে পারিবারিক রক্ষণশীলতার নির্মোক ক্রমশঃ খসে যাচ্ছে, বরফ গলতে শুরু করেছে।

এদিকে নিখোঁজ হওয়া মৃত গণেশের সন্ধানে তার বাপ স্ত্রী-কন্যা সহ দেশের বাড়ী থেকে ছুটে এসেছে। সে পাঁতি পাঁতি করে তার হারানো ছেলেকে খুঁজছে কিন্তু কে দেবে তার ছেলের সন্ধান। একাধিক জায়গায় ব্যর্থ সন্ধানে হয়রান হয়ে সে অবশেষে স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে মূল মিছিলের স্রোতে এসে পড়লো। মিছিল তখন সমস্ত বাধা প্রতিহত করে সম্মুখ পথে এগিয়ে চলেছে। জয়ের দীপ্তি, মিছিলের সকল মানুষের চোখে-মুখে। ওই মিছিলেরই অন্যতম অংশীদার কলেজপড়ুয়া নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে অজয়ের মনে হচ্ছে, "আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারেনি, আমরা এগিয়েছি।"

বইয়ের শেষ দুই ছত্র: "ঘাড় উঁচু হয়ে গেছে অজয়ের, দুটি চোখ জলজল করছে আনন্দে, উত্তেজনায়।···মুখে যেন তার সূর্য উঠেছে, মেঘ কেটে গেছে।"

এই সুস্পষ্ট অগ্রগতি ও বিজয়ের অনুভূতিতে চিহ্ন উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

সাহিত্যভাবনা

বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিবাস্ত শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কম বেশী আঠাশ বছরের সৃষ্টিশীল জীবনের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য বিষয়ে যে-সব চিন্তা-ভাবনা করেছেন তার পরিমাণ অত্যধিক না হলেও একেবারে নিতান্ত কমও হবে না। অন্ততঃ, ততটা পরিমাণ সাহিত্যচিন্তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন যার থেকে এই বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকের শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ মোটামুটি বোঝা যায়। যাকে বলা যায় সাহিত্য সংক্রান্ত প্রণালীবদ্ধ তত্ত্বদর্শন, তেমন দর্শন তিনি তাঁর ব্যস্ততাতাড়িত অস্থির অশান্ত সংগ্রামক্ষুব্ধ জীবনে গড়ে তোলার অবকাশ না পেলেও ছাড়া-ছাড়া ভাবে এখানে-সেখানে সাহিত্য বিষয়ক এমন সব মূল্যবান চিন্তার টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন যেগুলি একত্র কুড়িয়ে নিলেও বেশ একটা তাড়া হবে। নাই বা হলো সেগুলি সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত পূর্বাপর সযত্নগ্রথিত, তাই বলে সেগুলি থেকে মানুষটির সাহিত্যচিন্তার ছাঁচ অনুধাবন করতে মোটেই অসুবিধা হয় না।

দুটি মূল সূত্র থেকে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাহিত্য বিষয়ক ভাবনাচিন্তার পরিচয় জানতে পারি। এক তাঁর 'লেখকের কথা' নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থ থেকে; দুই তাঁর উপন্যাস ও গল্পসংগ্রহগুলির সংস্করণ ও সংস্করণান্তর সমূহের ভূমিকার সাক্ষ্য থেকে। এছাড়া শেষ বয়সের লেখা ডায়েরীর দিনলিপি-গুলিকেও ধরা যায়, তবে সে-সবের ভিতর প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের খুঁটিনাটি কথাই বেশী; একজন লেখক-শিল্পীর অন্তর্জীবনের গভীর-গূঢ় অনুভবের প্রমাণ তাতে বড় একটা নেই। এমন কি পরোক্ষভাবেও নেই। সুতরাং প্রথমোক্ত দুটি সূত্রের উপরেই মুখ্যত নির্ভর করা সমধিক যুক্তিযুক্ত হবে।

'লেখকের কথা' বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি—মৃত্যুর তিন বছর পর ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এতে কোনও একজন লেখক-শিল্পীর সাহিত্য জীবনের ভিত্তি, সংসার ও সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মূল্য, বেঁচে থাকার সমস্যা, চিন্তার স্বাধীনতা, প্রকাশক-লেখক-পাঠক সম্পর্ক, প্রগতি সাহিত্যের আদর্শ, বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ও অবৈজ্ঞানিক সাহিত্যে পার্থক্য, বাস্তববিরুদ্ধ ভাবালু মনোভঙ্গীর অসারতা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে মানিকের ধ্যান-ধারণার পরিচয় বিধৃত দেখতে পাই। এই পরিচয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে যে-জিনিসটা প্রথমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো তিনি চিন্তাপ্রবণ, প্রতিটি বস্তুর তল পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখার অদম্য কৌতূহলে

অস্থিরচিত্ত, ছোটবেলা থেকেই পিতার ঘন ঘন বদলির চাকরির সুবাদে স্থান থেকে স্থানান্তর গমনের সুযোগে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যজনিত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, নীচুতলার দরিদ্র খেটে-খাওয়া লোকজনদের প্রতি গভীর সহানুভূতিপরায়ণ, সহজাতরূপে জিজ্ঞাসু ও বিচারসন্ধিৎসু, সর্বোপরি হৃদয়াবেগের আতিশয্যের অর্থাৎ ভাবলুতার ঘোরতর বৈরী।

সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটিকে সর্বাগ্রে আলোচনা করে বলি, ওই-যে তাঁর প্রথম লেখা গল্প 'অতসীমামী' (১৯২৮), যা তিনি বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে লিখেছিলেন ও বাজি জিতেছিলেন, তা যদিও পূর্ববঙ্গের এক শিল্পী দম্পতীর নাটকীয় প্রেমের ট্রাজিক পরিণামের গল্প কিন্তু সেখানেও দেখা যাবে আমাদের বাংলা সাহিত্যে সচরাচর-প্রচলিত প্রেমের গল্পের ধাঁচ-ধরন থেকে এর জাত-গোত্র একেবারেই আলাদা। এতে নাটকীয়তা আছে, ট্রাজিক রসের আতিশয্য আছে কিন্তু ন্যাকামি ও ছ্যাবলামি নেই, যা কিনা এদেশের অধিকাংশ প্রেমের গল্পের প্রধান অবলম্বন। মানিক কখনও কখনও প্রেমকে উপজীব্য করে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন সত্যি কথা কিন্তু কোন সময়েই গতানুগতিক ছকের প্রেমের কাহিনীকে প্রশ্রয় দেননি—না গল্পে না উপন্যাসে। তাঁর এমন একটি রচনাও দেখানো যাবে না যেখানে তিনি 'দেখামাত্র প্রেম উপজিল' গোছের ফাঁপা ভাবালুতার বাষ্পে ভরা হাস্যকর অবাস্তবতার ফানুস উড়িয়েছেন অথবা অনুরাগ-পূর্বরাগ (কোর্টশিপ)-বিবাহ জাতীয় বাঙালী মধ্যবিত্তের চিরাভ্যস্ত মন-দেওয়া-নেওয়ার কাহিনীর ছক-কাটা দাগের উপর দাগা বুলিয়েছেন। মানিকের বর্ণিত প্রেম হয় অস্বাভাবিক (দিবারাত্রির কাব্য, হেরম্ব-আনন্দ কথা) নয় মনস্তাত্ত্বিক আলো-আঁধারে ঘেরা (পুতুলনাচের ইতিকথা, শশী-কুসুম কথা), নয় স্থূল দেহবাসনা সঞ্জাত (পদ্মানদীর মাঝি, কুবের-কপিলা কথা), নয় বিকৃত (চতুষ্কোণ)—কিন্তু কোন সময়েই রোমান্টিক নয়। রোমান্টিক ভাবাতিশয্য সঞ্জাত প্রেমকে তিনি বারে বারে ব্যঙ্গ করেছেন। দিবারাত্রির কাব্যে এর শুরু, রোমান্টিক হৃদয়োদ্বেলতার বিরুদ্ধে তাঁর এই আপসহীন অভিযান তিনি আমৃত্যু অব্যাহত রেখেছিলেন।

মানিক-সাহিত্যের দুটি পর্ব সুস্পষ্ট-চিহ্নিত ও সুবিভক্ত। ১৯২৮ সালে তাঁর লেখার শুরু হয়েছে যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলে ১৯৪০ পর্যন্ত কমবেশী বারো বছর কাল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ফ্রয়েডীয় পর্ব। এই পর্বে তিনি মানুষের নির্জ্ঞান মনের সুপ্ত কামনা-বাসনা-বিকার-অবদমিত ইচ্ছা-অতৃপ্ত ভোগলালসা প্রভৃতিকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে ব্যবচ্ছেদ করে এক ধরনের 'মর্বিড' জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটিয়েছেন

এবং পাঠক সাধারণকে তাঁর ওই অদ্ভুত অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভবের শরিক করেছেন। মানিকের ব্যবহৃত ভাষা অনুসরণ করে বলি তাঁর নিজের উপলব্ধি "অন্যকে দান করেছেন অর্থাৎ পাইয়ে দিয়েছেন"। (কেন লিখি ? লেখকের কথা)। মানিক এই ফ্রয়েডীয় কামায়নের প্রভাবের পর্বে যেসব গল্প লিখেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—প্রাগৈতিহাসিক, টিকটিকি, সরীসৃপ, মহাকালের জটার জট, বিষাক্ত প্রেম, সিঁড়ি প্রভৃতি। উপন্যাসের মধ্যে পড়ে —দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, এমন কি পদ্মানদীর মাঝির কোন কোন অংশ।

পক্ষান্তরে ১৯৪৪ সালে তাঁর কম্যুনিস্ট পার্টিতে আনুষ্ঠানিক যোগদানের সময় থেকে মৃত্যুকাল (১৯৫৬) পর্যন্ত অবিচ্ছেদ আরেক বারো বছর ছিল তাঁর সাহিত্য জীবনের সুচিহ্নিত মার্কসীয় পর্ব। মার্কস-এঙ্গেলস প্রচারিত এবং লেনিন-স্টালিন পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের প্রভাব-পরিধির মধ্যে থেকে তিনি এই অধ্যায়ে কতকগুলি সারবান উপন্যাস (যথা দর্পণ, চিহ্ন, স্বাধীনতার স্বাদ, সোনার চেয়ে দামী ২ খণ্ড, ইতিকথার পরের কথা প্রভৃতি) এবং অনেকগুলি অসামান্য শিল্পোৎকর্ষ মণ্ডিত প্রথম শ্রেণীর গল্প লিখেছেন (যথা, হারানের নাতজামাই, পেটব্যথা, পাশ-ফেল সংবাদ, মাসিপিসি, কংক্রীট, টিচার, শিল্পী, ছোট বকুলপুরের যাত্রী প্রভৃতি), ছোটগল্পের সংখ্যাই তুলনায় বেশী।

মাঝের চারটি বছর অর্থাৎ ১৯৪০-৪৪ সাল তাঁর বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ নামক রাজনৈতিক দর্শন (মার্কস প্রচারিত) এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নামক শৈল্পিক দর্শন (গর্কি-প্রবর্তিত)—এ দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতিকাল বলা যেতে পারে। অবশ্য প্রস্তুতি তার আগে থেকেই চলছিল, তিরিশের দশকের লেখায়ও এর অঙ্কুর খুঁজে পাওয়া যায় (দৃষ্টান্তস্বরূপ পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের উল্লেখ করা চলে), তবে এই অন্তর্বর্তী বর্ষচতুষ্টয়েই যেন সেই প্রস্তুতি রীতিমত দানা বেঁধে উঠছিল দেখা যায়।

সেই দিক থেকে বিচার করতে গেলে ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয় এই দুই সুচিহ্নিত পর্ববিভাজনের মধ্যবর্তী কালকে পরিস্ফুটনের কাল বলা যেতে পারে। 'ইনকিউবেশন'-এর কাল। এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস সহরতলী ২ খণ্ড এবং গল্প রচনার ক্ষেত্রে 'বৌ' পর্যায়ের গল্প। কিন্তু বৌ পর্যায়ের গল্পগুলিতে মার্কসীয় ভাবধারার অগ্রগতি অপেক্ষা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের পশ্চাৎটানই বেশী লক্ষ্য করা যায়। মানিকের সাহিত্যের এই প্রথম যুগসুলভ

অসুস্থ মনোবিকার তাঁর মার্কসীয় পর্বের কোন কোন লেখাতেও গিয়ে অতর্কিতে প্রবেশ করেছে। যেমন, চতুষ্কোণ (১৯৪৮) উপন্যাসে। একজন সমালোচক যথার্থই লিখেছেন যে, চিহ্ন (১৯৪৭) উপন্যাসের ঠিক অব্যবহিত পরবর্তীকালে এমনতর এক অস্বাভাবিক যৌনতার উপন্যাসের প্রকাশ অভাবনীয় বলা চলে। এ আর কিছু নয়, অভ্যাস নামক মজ্জাগত দ্বিতীয় স্বভাবের দুর্মর প্রবৃত্তির অসাধারণ আকস্মিক পুনরাবির্ভাবের এক ব্যত্যয়ী দৃষ্টান্ত মাত্র। বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন শৈল্পিক পরিবেশে ফ্রয়েডকে পুরাপুরি কাটান দেওয়া বড় সহজ কাজ ছিল না।

অনেকের ধারণা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার আগে পর্যন্ত যেসব গল্পোপন্যাস লিখেছিলেন সেগুলিতেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকুশলতা প্রকাশ পেয়েছিল, পরে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার ক্রমিক অবনতি ঘটে এবং শেষ অবধি তিনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক থেকে একজন প্রচারবাদী সাহিত্যিকে পরিণত হলেন। এই বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপে এঁরা মানিকের প্রথম পর্বের প্রাগৈতিহাসিক প্রভৃতি গল্প এবং দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা ও পদ্মানদীর মাঝি এই তিন উপন্যাসের উল্লেখ করেন। এঁদের এই ক্রমাগত মুখে মুখে রটানো কিংবদন্তীর ব্যাপক প্রচারের ফলে অনেক সময় বামপন্থী পাঠক-সমালোচকেরাও বিভ্রান্ত হন এবং এঁদের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে থাকেন মানিক যা কিছু ভাল লিখেছেন তা তিরিশের দশকেই লিখেছেন, চল্লিশের দশক থেকে এবং শেষের দিকে তো রীতিমত শিল্পসৌন্দর্য বর্জিত জনজীবনভিত্তিক কাঠখোট্টা লেখাই তাঁর লেখনীর মূল উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ কিনা সাহিত্যের দাবি অগ্রাহ্য করে এই পর্বে তিনি প্রচারের দাবিকেই বেশী মর্যাদা দেন—তাঁর বিরুদ্ধে অবাম-বাম সব ধরনের পাঠকেরই অল্পবিস্তর নালিশ এই।

ভাববাদী সমালোচনারীতির এখনও পর্যন্ত কী অপ্রতিহত প্রভাব এদেশে বিদ্যমান এই ঘটনায় তার প্রমাণ মেলে। ওই যে মানিক প্রথম পর্বের গল্পোপন্যাসে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্জ্ঞান মনের বিকৃত কামনা-বাসনার উৎসকে ঘিরে মানসিক চিকিৎসকের মনোবিকলনধর্মী চিকিৎসার রীতিতে পর্দার ঘেরাটোপে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র কক্ষে শায়িত রোগী বা রোগিনীর মনের কথা টেনে বার করবার ব্যবচ্ছেদী প্রক্রিয়া অবলম্বনে লেখনী চালনা করেছিলেন, সেই ফ্রয়েডীয় 'মিস্টিক' রচনাপদ্ধতিই অদ্যাবধি আমাদের অধিকাংশ পাঠকের মনোহরণ করে রেখেছে। কিন্তু যা-ই মাত্র তিনি ব্যক্তিমনের অন্ধকার গুহাগহ্বর ছেড়ে মুক্ত দৃষ্টিতে সমষ্টিবদ্ধ সমাজজীবনের দিকে তাকিয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন সংগ্রামশীল

সাধারণ গণমানুষের দুঃখ-বেদনা শোষণ ও বঞ্চনার অপরিমেয় গভীরতা, অমনি তাঁর লেখার বিরুদ্ধে বহির্মুখীনতার অভিযোগ এনে তাঁর লেখার শিল্পগুণকে খারিজ করার একটা পরিকল্পিত চেষ্টার সূত্রপাত হয় আমাদের সাহিত্য-সংসারে। যেন ব্যক্তিজীবন থেকে সমষ্টিজীবনে উত্তরণ ঊর্ধ্বায়ন নয়, অধঃপতন। যেন অন্ধকার থেকে আলোতে আসা গুণ নয়, দোষ। যেন একক ব্যক্তির কামনা-বাসনার ব্যবচ্ছেদী বিশ্লেষণ ছেড়ে বহু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভিত্তিক সঙ্ঘবদ্ধ সুস্থ আন্দোলন ও তার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি-দাওয়াকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে ভাষা দেওয়া একটা মস্ত বড় অপরাধ।

এ বিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের কথাই অবধান করা যাক। তাহলেই বুঝতে পারা যাবে পূর্বোক্ত দুই পর্বের সাহিত্যের মধ্যে মানিক স্বয়ং কোন পর্বের সাহিত্যকে বেশী মূল্যবান মনে করতেন। এ সম্পর্কে তিনি কোন সন্দেহের অবকাশই রাখেননি—তাঁর স্বীয় পক্ষপাত যে পরবর্তী পর্বের রচনার ধারার দিকেই সুস্পষ্টরূপে ন্যস্ত ছিল সে সম্বন্ধে তাঁর জবানী অতি পরিষ্কার।

মানিক লিখছেন—"আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি।" কিংবা তাঁর এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি, "লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি।"

কিন্তু এই খাতে মানিকের সবচেয়ে মূল্যবান স্বীকারোক্তি আমরা তাঁর নীচের কথাগুলির মধ্যে পাই—"প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদ ঘাঁটতে ঘাঁটতে যখন আমার এতদিনের লেখার ত্রুটি-দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আমার সাহিত্যসৃষ্টি মানুষকে এগিয়ে যেতে এতটুকু সাহায্য করার বদলে আরও বিভ্রান্ত করছে কিনা সন্দেহ জেগেছিল এবং সোজাসুজি নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়েছিল যে, **আমার অর্ধেক জীবনের সাধনা কি বাতিল বলে গণ্য করতে হবে?**" (হরফের স্ফীতি সংকৃত)।

উদ্ধৃতির পূর্বাপর প্রসঙ্গ বিবেচনা করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না মানিক এখানে "অর্ধেক জীবনের সাধনা" বলতে তাঁর সাহিত্য জীবনের পূর্বার্ধকেই বুঝিয়েছেন অর্থাৎ সেই অর্ধ যে-অর্ধে তাঁর লেখায় তদানীন্তন 'কল্লোল' 'কালিকলম' গোষ্ঠীর লেখকদের অনুসরণে এবং কতকটা নিজের ব্যক্তিগত

ঝোঁকের দরুনও বটে, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের আদর্শের মারাত্মক আধিপত্য ছিল। এই পর্বে যৌনতা ও মনোবিকার উৎকট এক ব্যাধির মত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করেছিল—সমাজের সমষ্টিগত শোষণ-অবদমন-অত্যাচার-অবিচারের প্রকৃত রূপটি তখনও তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হতে পারেনি। ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মলীনতার অভ্যাস যদি একটা আবেশের (অবসেসন্) মত কেবলই লেখকের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাকে কতকগুলি অসুস্থ অর্ধ-অসুস্থ, অস্বাভাবিক ও বিকারগ্রস্ত নরনারীর মনের গোলকধাঁধা সদৃশ আঁকাবাঁকা জটিল গলি-ঘুঁজির রহস্যাবৃত আঁধার গহনে বারে বারে ঘুরিয়ে ফেরায় তবে সে-লেখক কেমন করে সমষ্টিগত সমাজজীবনের রৌদ্রালোকের মধ্যে আপনাকে উত্তীর্ণ করবেন? অন্ধকার থেকে আলোতে আসবেন?

তবু যে এই অসুস্থ মনোবিকলনী অভ্যাসের আতিশয্য সত্ত্বেও মানিক প্রথম পর্বে পুতুলনাচের ইতিকথা আর পদ্মানদীর মাঝির মত দুটি অতিশয় শক্তিশালী উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন তার রহস্য নিহিত আছে তাঁর প্রতিভার মধ্যে, তাঁর লেখক-ব্যক্তিত্বের অনন্যতার মধ্যে। তাঁর প্রতিভার যাদুতেই তিনি বিষ থেকে অমৃত উত্তোলন করেছিলেন—পাঁক থেকে পদ্ম ফুটিয়েছিলেন। ভাববাদী সমালোচকেরা দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসটিকেও বিশেষ শক্তিশালী আখ্যা দেন এবং পূর্বোল্লিখিত দুই প্রধান উপন্যাসের সমসারে ফেলতে চান। কিন্তু দিবারাত্রির কাব্য শক্তির লক্ষণাক্রান্ত হলেও মূলতঃ মনোবিকারের চিহ্নদুষ্ট রচনা; ওটি কোন এক প্রসিদ্ধ সমালোচকের মন্তব্য ধার করে বলি "জটিল-কুটিল মনের সৃষ্টি।" সুতরাং তাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হবার কারণ দেখিনে।

ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের পদ্ধতিতে যৌনতা ও কামায়নের আতিশয্যকে যদি একটা ব্যাধির সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সেই ব্যাধির প্রতিষেধক মানিক খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর নিজ জীবনেরই পরবর্তী পর্বে, যে-পর্বে তিনি যৌনতাকে পরিহার করে, অর্থনীতিই সমাজ জীবনের মূল নিয়ামক—এই বিশ্বাসের তীরে সমুত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অর্থাৎ ফ্রয়েডকে বর্জন করে যখন থেকে তিনি মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানের মতবাদকে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মুখ্য সঞ্চালিকা প্রেরণারূপে গ্রহণ করলেন তখন থেকে তাঁর গোত্রান্তর ঘটলো—তিনি মুক্তিস্নান করে 'রূপনারাণের কূলে' জেগে উঠলেন। সমষ্টিচেতনার বিশল্যকরণীর প্রভাবে তাঁর ব্যক্তিবাদী মোহনিদ্রার অবসান ঘটলো।

তবু যে ওই পর্বেও তিনি চতুষ্কোণের মত মনোবিকারধর্মী উপন্যাস

লিখেছিলেন তার কারণ পূর্বেই ব্যক্ত করেছি—এই ঘটনাকে একটা পশ্চাৎটান-মূলক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করাই বোধহয় শ্রেয়।

লক্ষণীয় এই যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে তার ভুল-ভ্রান্তি গলদ ও দুর্বলতা আবিষ্কারে সদা সচেষ্ট ছিলেন। সমালোচনায় তিনি অসহিষ্ণু হতেন না বরং পরম ধৈর্য ও নম্রতার সঙ্গে প্রতিপক্ষের বক্তব্য অনুধাবন করবার চেষ্টা করতেন। লেখক-সত্তাকে সব দিক দিয়ে নিখুঁত করে তোলবার জন্য তাঁর যত্নের অবধি ছিল না এবং ক্রমাগত আত্মপরীক্ষা আর আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হতে হতে তিনি শিল্পকে শিল্পোৎকর্ষের শীর্ষবিন্দুতে স্থাপন করবার অক্লান্ত সাধনায় আপনাকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। অহংকারকে তিনি শিল্পসাধনার সার্থকতার সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক মনে করতেন। আত্মপ্রেম তাঁর চোখে ছিল বিষবৎ পরিত্যাজ্য। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন—"কলম-পেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই। এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আপশোস জাগে যে, খাঁটি লেখক কবে হবো?"

কিংবা তাঁর এই উক্তিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: "হঠাৎ একটা গল্প লিখে মাসিকে ছাপিয়ে কি কেউ লেখক হতে পারে? হাত মক্স করতে হয়—কঠিন সাধনায় জীবনপাত পরিশ্রমে মক্স করতে হয়। কেরাণীর বেশী খেটে লিখতে না শিখে জগতে আজ পর্যন্ত কেউ একটি ছোটখাট লেখকও হতে পারেননি। হঠাৎ কি কেউ লিখতে শেখে না, পারে? সাহিত্য সাধনার জিনিস। এ সাধনার সূত্রপাত কিভাবে হয়। অনেক সাহিত্যিকের জীবনে তার চমকপ্রদ উদাহরণ আছে।" কিংবা "সাহিত্য করার আগে" প্রবন্ধের এই উক্তি: "…হঠাৎ কোন লেখকই জন্মায় না। রাতারাতি লেখকে পরিণত হওয়ার ম্যাজিকে আমি বিশ্বাস করি না।"

অথবা প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে মানিক প্রতিভার যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মধ্যেও তাঁর দৃষ্টিকোণের মৌলিকতা সুপরিস্ফুট। প্রতিভাকেও তিনি সাধনায় পরিণামফল বলে মনে করেন, জন্মার্জিত সংস্কার বা নৈপুণ্যের সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই বলে তাঁর ধারণা। অর্থাৎ প্রতিভা সাধনালব্ধ। তথাকথিত "অশিক্ষিতপটুত্ব" বা স্বতঃস্ফূর্ততার তত্ত্বের সঙ্গে এর ন্যূনতম যোগও নেই। মানিকের কথা হলো: 'প্রতিভা জন্মগত'—প্রতিভাবানদের এ প্রত্যয়ের মূলে আছে "আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তা।"

অর্থাৎ প্রতিভার তত্ত্বে গতানুগতিক বিশ্বাসীরা দৈব অনুগ্রহের স্বতঃস্ফূর্ততার

মধ্যে কাল্পনিক নিরাপত্তা খোঁজে, রহস্যময়তার অলীক রোমাঞ্চ অনুভব করে। সাহিত্যের শক্তি যে স্বর্গীয় ফুলের মত আকাশ থেকে টুপ করে ঝরে-পড়া পড়ে-পাওয়া জিনিস নয়, তার জন্য কঠিন শ্রম করতে হয়—এই সত্যে তাঁর আস্থা ছিল খুবই সুদৃঢ়। তাই পর্ব থেকে পর্বান্তরে উত্তরিত হবার জন্য তিনি সুকঠোর তপস্যার শরণ নিয়েছিলেন, অনায়াসসাধ্য কিংবা অবলীলায়িত উন্নতির সম্ভাবনাকে মোটেই আমল দেননি। তপস্যা অর্থে যন্ত্রের তপস্যা নয়—আত্মজ্ঞান, আত্মসমালোচনা, আত্মপরীক্ষার তপস্যা, বিরামবিহীনভাবে অনবরত নিজেকে নিজে সংশোধনের তপস্যা, নিরন্তর চেষ্টা ও যত্নের মধ্য দিয়ে তিনি লেখক হিসাবে যতদূর সম্ভব আপনাকে নিখুঁত করে তোলার ব্রতে নিয়োজিত ছিলেন।

এই মানদণ্ডে বিচার করলে বোঝা যাবে মানিক তাঁর প্রথমার্ধ পর্বের রচনা-প্রয়াসকে ভুলভ্রান্তিময় বলে বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয় পর্বের রচনাপ্রয়াসকে সত্যের অধিকতর সমীপবর্তী বলে মনে করেছেন। আত্মজ্ঞানের চর্চার মধ্য দিয়েই তিনি এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন। তাঁর এই নিবিড় উপলব্ধির অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাস রচনার কাল (১৯৩৬) থেকে। তারপর সহরতলী উপন্যাসে (১৯৪০) এই চেষ্টা আরও বেশী দানা বাঁধে। অতঃপর দর্পণ (১৯৪৫), চিহ্ন (১৯৪৭) প্রভৃতি উপন্যাসে আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর বহির্মুখী সামূহিক দৃষ্টিতে রূপান্তর সম্পূর্ণতা পায়। শেষ দশ বছরের লেখা ছোটগল্পগুলি তো মানিকের লেখক-সত্তার মৌলিক রূপান্তরের দলিল বিশেষ।

উপরে যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হলো তার সবই 'লেখকের কথা' বই থেকে উৎকলিত। অন্যান্য বইয়ের ভূমিকা থেকেও দু-একটি উদ্ধৃতি উৎকলন করা চলে।

মানিক-সাহিত্যের মনোযোগী ছাত্রমাত্রেই জানেন মানিক মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের জীবনযাত্রার অন্তর্নিহিত কাপট্য ও ভণ্ডামির প্রচণ্ড বৈরী ছিলেন এবং তার মূল্যবোধগুলির প্রতি ছিলেন বীতস্পৃহ। সমুদ্রের স্বাদ নামক গল্পসংগ্রহের দ্বিতীয় সংস্করণেও এই বিষয়টির উপর আলোকপাতকারী একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকার কতকাংশ এইরূপ: "প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে। একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে, মূর্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিতে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে

উপভোগ করার নেশায় মর মর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। তখন জানা ছিল না যে ওগুলি জীবনযুদ্ধের ক্ষত নয়, জরার চিহ্ন, ভাঙনের ইঙ্গিত ; জানা ছিল না যে স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী ও তাতেই মঙ্গল—সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।"

এই জানা ছিল না'টাই আসল কথা। এরই মধ্যে নিহিত আছে তাঁর প্রথম পর্ব ও শেষ পর্বের ভিতরকার মৌলিক পার্থক্যের সংকেত। শেষ পর্বে তিনি অনেক কিছু 'জেনেছিলেন'—মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার সাহায্যে পূর্বেকার অজ্ঞানতাকে বিদ্ধ করে তার বিনাশের মধ্য দিয়ে নূতন উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার পথ খুঁজে বার করেছিলেন।

পূর্বোক্ত ভূমিকারই অন্যত্র তিনি বলেছেন—…"তাই দরদ দিয়ে নির্মম আত্মসমালোচনায় আমি আজও বিশ্বাসী।" এই আত্মসমালোচনা, নিরন্তর স্বীয় বুদ্ধিগত ও হৃদয়গত অবস্থানকে যাচিয়ে বাজিয়ে তলিয়ে দেখা, প্রয়োজন হলে পূর্বের অবস্থানকে বর্জন করে নূতনতর অবস্থানে নিজেকে স্থাপিত ও পুনঃসজ্জিত করা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ভাবনার এইটেই হলো সবচেয়ে অবধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এমন নির্মম আত্মসমালোচক আমাদের সাহিত্যে খুব কমই জন্মেছেন।

পরিশিষ্ট—১

শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বিশিষ্ট কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকান্তরিত হয়েছেন কিছুকাল হল। গত কয়েক মাস ধরে এই শক্তিমান লেখকের সাহিত্যকৃতি, শিল্প-প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক আলোচনা হয়েছে। সে সব আলোচনার মধ্য দিয়ে আলোচকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারক্রিয়ার পার্থক্য যতই অভিব্যক্ত হোক, এই এক বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত হয়েছেন যে, মানিকবাবু রিয়ালিস্ট লেখক ছিলেন এবং সাহিত্যে তাঁর নিষ্ঠা অসাধারণ ছিল।

স্পষ্টতঃই এ দুটি বিচার এক পর্যায়ের নয়। মানিকবাবু রিয়ালিস্ট ছিলেন এটি তাঁর সাহিত্যের বিচার; অন্য পক্ষে তাঁর অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক নিষ্ঠা তাঁর জীবনের বিচার। এ দুটিকে একত্র গুলিয়ে ফেলার কোন কারণ নেই, যদিও মৃত্যুর অব্যবহিত সান্নিধ্যে শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে আমরা এ দুটি বিচারক্রিয়ার মধ্যে কিঞ্চিৎ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি, সে কথা স্বীকার করতেই হয়। আজ শোকের গাম্ভীর্য ও গভীরতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হয়েছে, শোকাহত চিত্তের উক্তি ও যুক্তির মধ্যে নিরপেক্ষতার আবহাওয়া সঞ্চালিত হবার মত যথেষ্ট সাময়িক অর্থাৎ কালগত ব্যবধান রচিত হয়েছে। সুতরাং যতদূর সম্ভব অপক্ষপাত মনোভাব (যতদূর একজন লেখকের সাধ্যে কুলায়) নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতি ও ব্যক্তিত্বের উপর একনজর চোখ বুলনো সম্ভবতঃ আজ আর বেমানান ঠেকবে না। বর্তমান নিবন্ধে আমি সেই চেষ্টাই করব।

২

রিয়ালিজম-এর প্রসঙ্গ পরে উত্থাপন করা যাবে। গোড়ায় মানিকের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টা করা যেতে পারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনের ধারা পর্যালোচনা করে আমার যে কথা বরাবর এবং বার বার মনে হয়েছে তা হচ্ছে এই, এই লেখক অতিশয় সৎপ্রকৃতির শিল্পী ছিলেন, এঁর মনের গড়ন ছিল আদর্শবাদীর।

বাজি ধরে সেই যে তিনি প্রথম যৌবনে সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন তারপর আর কোন কারণেই সাহিত্যকে ত্যাগ করার কথা তাঁর মনে হয়নি। এ দেশে সংসাহিত্য-সেবার অবধারিত পুরস্কার দারিদ্র্য—দারিদ্র্যের ভয় মানিকের সাহিত্যনিষ্ঠাকে প্রতিহত করতে পারেনি। দারিদ্র্যের ভয় তো শুধু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণের অভাবের ভয়ই নয়, এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে সামাজিক ঔদাসীন্য আর অবহেলা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-অপমান, অনৈশ্চিত্যের ভীতি আর কর্মকুশলতার হানি। এ সমস্তর আশঙ্কা মেনে নিয়েই তিনি সাহিত্যের সেবায় অবিচল ছিলেন। অসার লোকখ্যাতি আর সামাজিক কৌলীন্যের লোভে তিনি সস্তা জনপ্রিয়তার পথে পা বাড়াননি। তিনি যে ধরনের সাহিত্যরচনায় অভ্যস্ত, বিশেষতঃ যে মনোবিশ্লেষণ তাঁর একান্ত প্রিয় ছিল, তা সর্বাংশে জনমনের গ্রহণীয় নয় জেনেও তিনি ওই সাহিত্যরীতি থেকে বিচ্যুত হবার কথা কখনও চিন্তা করেননি। হয়তো তাঁর অন্যবিধ সাহিত্যরচনার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল. কিংবা একেবারেই ছিল না; কিন্তু আটাশ বছরের একটানা সাহিত্যিক জীবনে তিনি যে শুধু ওই একই প্রকারের মনস্তত্ত্বমূলক গল্পোপন্যাস রচনার আদর্শে স্থিতচিত্ত ছিলেন. তাতেই তাঁর অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আসল কথা. মানিকবাবু চরিত্রে ও বিশ্বাসে মোটেই সুবিধাবাদী ছিলেন না। আমাদের সাহিত্যে সুযোগসন্ধানী, যে-কোন-মূল্যে-সাফল্যপ্রয়াসী লেখকের সংখ্যাই অধিক। এঁদের মত মানিকবাবু দুদিন বাদে বাদে ফ্রন্ট বদলাননি। মানিকবাবুর শিল্পগত বিশ্বাসের যৌক্তিকতায় আমার তেমন আস্থা নেই, কিন্তু মানতেই হবে যে, তাঁর বিশ্বাস ভুল হোক শুদ্ধ হোক, তিনি তাঁর নিজের বিশ্বাসের ভূমিতে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান ছিলেন। এই দৃঢ়তা অন্যান্য লেখকদের মধ্যে থাকলে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের চেহারা ভিন্নরূপ হত। নেই, দেশবাসীর দুর্ভাগ্য!

মানিকবাবুর চরিত্রের এই আদর্শবাদ আমাকে একান্তভাবেই আকর্ষণ করে। তিনি যে-সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনারীতির পরিপোষক ছিলেন তার ঔচিত্যানৌচিত্য সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা উত্থাপন করা যায়—দৃষ্টান্তস্বরূপ, লেখকের নিরাবরণ বাস্তবতার আদর্শ পুরাপুরি মেনে নেওয়া কঠিন; কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য মূল্য দিয়েছেন, ওই বিশ্বাসকে তাঁর সাহিত্যে বাস্তবায়িত করে তুলতে কোন ক্ষয়-ক্ষতি-ত্যাগ স্বীকারেই পশ্চাৎপদ হননি। সংশ্লিষ্ট মহলের বিরাগ-ভাজন হবার ঝুঁকি নিয়ে পুনরায় বলছি, এই গুণ আমাদের সাম্প্রতিক

লেখক-সমাজের মধ্যে অতিশয় বিরল। অন্তকার অধিকাংশ লেখক শিল্পেরই শুধু সাধনা করেন, জীবনের সাধনা করেন না। শিল্প যে জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত—এই বোধের পরিচয় ক্বচিৎ-কখনও তাঁদের সাহিত্যে পাওয়া গেলেও তাঁদের নিজ জীবনে পাওয়া যায় না। তাঁদের নিজ নিজ জীবন বৈষয়িকতার এক-একটি মূর্ত প্রতীক। মানিকবাবুর চরিত্রে ওই অশিল্পীজনোচিত বৈষয়িক বুদ্ধির একান্তই অসদ্ভাব ছিল। বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবের ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। এতে তাঁর শিল্পজীবন সমৃদ্ধ হয়েছে, ব্যক্তিগত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত। বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবে তিনি নিজের ভালমন্দও বুঝতে শেখেননি। ত্যাগধর্মী সেবার আদর্শ সামনে রেখে দেশকে অমৃত বিলোবার আশায় তিনি নিজ জীবনে অপরিমিত মাত্রায় দুঃখের গরল পান করেছিলেন ; কিন্তু এমনই তাঁর আদর্শবাদের আতিশয্য ও উগ্রতা যে, ওই গরল শুধু তাঁর ব্যক্তি-জীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর জীবনপাত্রের কানা উপচে সে গরলের ছিটে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে এসেও লেগেছিল। সকল প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মত তিনিও তাঁর সাহিত্যের ভাণ্ডে অমৃতই পরিবেষণ করতে চেয়েছেন, পরিতাপের বিষয় তাঁর বেলায় ওই সাহিত্যামৃত কথঞ্চিৎ বিষদুষ্ট হয়ে উঠেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্যন্তিক রিয়ালিজম-ঘেঁষা মনোভাব তাঁকে শিল্পজীবনে সৌন্দর্যের আদর্শ থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই বিচ্যুত করেছে। এমন কি, মধ্য ও শেষের দিকের লেখায় তিনি সচেতন-ভাবে অসুন্দরের পূজারী হয়ে উঠেছিলেন বললেও অন্যায় হয় না। একজন অসাধারণ মনোজীবী শক্তিমান লেখকের পক্ষে জেনে-শুনে অশুভের-পথে-পা-বাড়ানো-রূপ ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু মানিকবাবুর স্বভাবের আত্যন্তিক আদর্শবাদী স্বরূপের সঙ্গে যাঁরই পরিচয় আছে তিনি লেখকের এই পরিণতিতে দুঃখিত হলেও বিস্মিত হবেন না। মানিকবাবু প্রকৃতিতে অতিশয় সৎ ছিলেন বলেই তিনি তাঁর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সবটুকু সরেজমিনে পরিমাপ করতে পিছপাও হন নি, আর হন নি বলেই অশুভের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেও তাঁর ভয় হয়নি। যে-বিশ্বাসের ভূমিতে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, সেই বিশ্বাস পরখ করতে গিয়ে মধ্যপথে ছেদ টেনে হার স্বীকার করবার মত দুর্বলচেতা লেখক তিনি ছিলেন না। তাঁর চারিত্রিক গঠনের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিল। এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সততারই নামান্তর। যদিও উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে মানিকবাবুর এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা কখনও পরিমার্জনা লাভ করতে

পারেনি, কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, ওই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সহায়েই তিনি শুভাশুভমিশ্রিত জীবনের সমগ্র রূপটিকে অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। মানিকবাবু কেমন করে লেখক হলেন সে গল্প নিজমুখেই বিবৃত করেছেন। সেই বিবরণ থেকে জানা যায় বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। এক ধরনের আত্মপ্রসাদ এই অনুরাগকে ঘিরে ছিল। বিজ্ঞানকেন্দ্রিক ওই আত্মপ্রসাদ মানিকবাবুর প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে, কেন না ওই আত্মপ্রসাদের হাতছানিতে ভুলেই তিনি মানবীয় ব্যবহার ও মনস্তত্ত্বের অন্ধিসন্ধি পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন। বিজ্ঞানীজনোচিত অনাসক্তির সহিত অশুভের সঙ্গে পাল্লা লড়তে গিয়ে তিনি শেষ অবধি অনাসক্তি বজায় রাখতে পারেননি। নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি ক্লেদরতির পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। আত্মতুষ্টির হাতে-ধরা হয়ে তিনি যে ফাঁদে একবার পা দিলেন, সে ফাঁদ থেকে তাঁর সারা জীবনে আর বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি।

৩

রাজনৈতিক বিশ্বাসের নিষ্ঠায় শুধু যে মানিকবাবুর শিল্পীমানসের পরিবর্তন হয়েছিল তাই নয়, তাঁর ভাষাভঙ্গীরও আমূল রূপান্তর সাধিত হয়েছিল। মানিকবাবুর ভাষা কোন সময়েই সুন্দর ছিল না। এমন কান্তি ও চারুতা-বর্জিত ভাষা কাঠখোট্টা প্রবন্ধ-লেখকের কলমেও যোগায় না। তার উপর ওই ভাষা ছিল একান্তভাবেই তাঁর বিশিষ্ট চিন্তাপ্রণালীর বাহন, ফলে ও-ভাষার মধ্যে ট্রাডিশন কিংবা সাম্প্রতিক রচনারীতি কোনটিরই তেমন প্রভাব পড়েনি। মানিকবাবুর চিন্তা করবার ধরনটি ছিল যেমন একেবারেই স্ব-তন্ত্র, অন্য কোন লেখকের চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে আদৌ মেলে না, তেমনই তাঁর ভাষাও ছিল তদনুরূপ। লেখকের রোমান্টিসিজমের ধাত মোটে ছিল না। বস্তুতঃ, সর্বপ্রকার রোমান্টিসিজমের প্রতি তাঁর মনে প্রচণ্ড বীতস্পৃহা ছিল। যে 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসকে লেখক স্বয়ং "প্রেমকে ভিত্তি করে লেখা বই" বলে অভিহিত করেছেন এবং কুড়ি-একুশ বছরেই ওই-জাতীয় প্রেমের গল্প লেখা শোভা পায় বলে মত প্রকাশ করেছেন, সেই বইয়ের ভিতরও বাজারচলতি প্রেমের ধারণা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ওতে প্রেমিক-প্রেমিকার গহনগূঢ় রহস্যে আবৃত অর্ধ-জাগ্রত-অর্ধ-সুপ্ত মনের জটিলতার জট খোলাই লেখকের প্রধান ব্যসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বইটি 'দিবারাত্রির কাব্য' হলেও তার মধ্যে গতানুগতিক কাব্যের আমেজ সামান্যই পাওয়া যায়। বইটির অংশবিশেষ সম্পর্কে 'আত্মস্মৃতি'র লেখক

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস যথার্থই লিখেছেন, এটি এমন এক মনের রচনা "যে মন সরল সাধারণ নহে, কুটিল জটিল অসাধারণ।" মানিকবাবুর কুটিল জটিল অসাধারণ মননের ছাপ তাঁর ভাষাভঙ্গীর উপর অতি-সুস্পষ্ট। এবং বলাই বাহুল্য, এ-জাতীয় মননক্রিয়ার যা দোষ ও গুণ, অবধারিতভাবে তা তাঁর ভাষার উপরেও বর্তিয়েছে। মানিকবাবুর মননক্রিয়া কুটিল বলেই তাঁর লেখার ভিতর প্রসন্নতা নেই, সরসতা তার চেয়েও কম মাত্রায় উপস্থিত। 'দিবারাত্রির কাব্যে' লেখক এক জায়গায় লিখছেন—

"এরা কেউ বিশ্লেষণ ভালবাসে না, সুপ্রিয়াও নয়, আনন্দও নয়। তার এ কি অভিশাপ যে, এরা কেন বিশ্লেষণ ভালবাসে না বসে বসে তাও বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা হয়? এ কি জ্ঞানের জন্য? নারীকে জেনে সে কি জীবনের নাড়ীজ্ঞান আয়ত্ত করতে চায়? তার লাভ কি হবে? বরং আজ পর্যন্ত তার যা ক্ষতি হয়েছে তার তুলনা নেই। জীবনের সমস্ত সহজ উপভোগ তার বিষাক্ত বিস্বাদ হয়ে যায়।"

কথাগুলি খোদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কেও সর্বাংশে প্রযোজ্য। আত্যন্তিক মনোবিশ্লেষণের অভ্যাস লেখকের অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাশীলতার ফলে যেমন কখনও-কখনও দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়, তেমনই অপরিমিতমাত্রিক মনোব্যবচ্ছেদের প্রবণতাও জীবনের সহজ আনন্দকে বিষাক্ত বিস্বাদ করে দিতে পারে। প্রমাণ হাতড়াবার জন্য দূরে যেতে হবে না, মানিক-সাহিত্যই সেই জলজ্যান্ত প্রমাণ। এই ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানোক্ত পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রীতি অনুযায়ী মানিকবাবুর সাহিত্য ও জীবন দুই দুইকে প্রভাবিত করেছে। মানিকবাবুর উৎকট মনোবিশ্লেষণের ব্যাধি তাঁর চিত্তের প্রসন্নতা হরণ করে তাঁর সাহিত্যের প্রসন্নতাও সেই সঙ্গে হরণ করেছে, উলটো তাঁর সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন ও ঐকান্তিক মনোজীবিতা মন নামক অদ্ভুত পদার্থটি ছাড়া আর কোন বিষয়েই লেখককে সচেতন হতে দেয়নি। মানিকবাবু যদি আর একটু বহির্মুখী হতেন, কী চমৎকারই না হত! সে ক্ষেত্রে শুধু যে তাঁর morbidity-রই শোধন হত তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষাভঙ্গীরও শোধন হত, ভাষার ভিতর কান্তি, ঔজ্জ্বল্য আর প্রসাদগুণের আবির্ভাব ঘটত। প্রথম দিককার লেখায় তবু যা-হোক কিঞ্চিৎ ধ্বনিময়তা, সৌন্দর্যবোধ, পরিচ্ছন্ন বিন্যাসের চেতনা উপস্থিত ছিল; শেষের দিকের ভাষাভঙ্গী রসহীন উৎকট বাস্তববাদের রৌদ্রদাহে একেবারে শুকিয়ে আমসি হয়ে উঠেছিল। মিষ্টত্বের নামগন্ধও তাতে ছিল না।

এ উক্তি যে নিতান্ত কথার কথা নয়, তা 'পুতুলনাচের ইতিকথা' এবং তার বহু বৎসর পরের লেখা 'ইতিকথার পরের কথা' বই দুটির ভাষাভঙ্গী মিলিয়ে বিচার করলেই বোঝা যাবে। প্রথমের ভাষায় আছে মানবমনের জটিলতার নিখুঁত শিল্পীজনোচিত প্রকাশকুশলতার ছাপ; দ্বিতীয়ের ভাষা কাটা-কাটা, ভাঙা-ভাঙা, লেখকের মানসিক আলস্যপ্রসূত লেখনীসঞ্চালনবিমুখতার দ্বারা পদে পদে আড়ষ্ট। বাক্যের ব্যবহারে ব্যয়কুণ্ঠা এ ক্ষেত্রে শিল্পসচেতনতার প্রমাণ না হয়ে নৈরাশ্যবাদ তথা জাড্যের প্রমাণ হয়েছে। মনে হয় অন্তর্বর্তী বৎসরগুলিতে লেখকের মনোজীবনে এমন এক গভীর বিপর্যয় ঘটে গেছে, যার ছাপ তাঁর ভাষার মধ্যেও গোপন থাকেনি। শেষের পর্যায়ের মানিক-সাহিত্যের ভাষাভঙ্গী অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, যে মন এই ভাষাভঙ্গীর জন্মদাতা সে মন ক্লান্ত, হতাশ, নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে লেখনী-সঞ্চালনে অনিচ্ছুক। গভীরভাবে সৎ এবং আদর্শবাদী হওয়া সত্ত্বেও শেষের দিকে তিনি আত্মপ্রকাশের তাগিদ হারিয়ে ফেলেছিলেন। উপরের নামীয় 'ইতিকথার পরের কথা' বইটিই শুধু নয়, তাঁর অকালে-নিঃশেষিত জীবনের শেষের পর্বের যে-কোন বই-ই আমার এ কথার সাক্ষ্য দেবে বলে মনে করি। মানিকবাবুর সর্বশেষ রচনাগুলির অন্যতম রচনা 'শুভাশুভ' (১৩৬১) এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে রয়েছে। এ বইটির অজস্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটির ফাঁকে এমন একটি অনুচ্ছেদ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যার মধ্যে পূর্বতন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পপ্রতিভার ছিটেফোঁটাও পাওয়া যায়। বেশী কি কথা, এমন যে একুশ বছরের রচনা 'দিবারাত্রির কাব্য', তার মধ্যে যে উপলব্ধির গভীরতা আছে তাঁর অনেক পরবর্তী রচনাতেই তা সুদুর্লভ। শেষের দিকে মানিকবাবু একান্তভাবেই রুদ্র-রুক্ষ সমাজ-বাস্তবতার কক্ষাশ্রয়ী, সেই সঙ্গে নগ্নতার পরিপোষক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু গোড়ায় তাঁর ভিতর এ জিনিস ছিল না—একটা সহজ চিন্তাশীলতার সঙ্গে অনুভূতির প্রগাঢ়তা মিশে তাঁর রচনাভঙ্গীর মধ্যে শিল্পকুশলতার সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটেছে। এই অভিব্যক্তিরই অন্যতর প্রমাণ 'দিবারাত্রির কাব্যে'র নিম্নবর্তী অনবদ্য লাইনগুলি—

"...পরিপূর্ণ প্রেমের অনন্ত দাবী মেটাবার ক্ষমতা আছে একমাত্র অবিলম্বিত, অনপচয়িত, সুস্থ ও শুদ্ধ যৌবনের। অভিজ্ঞতায় প্রেমের খোরাক নেই, মনস্তত্ত্বে ব্যুৎপত্তি প্রেমকে টিকিয়ে রাখার শক্তি নয়। নারীকে নিয়ে একদিনের জন্যও যে খেয়ালের খেলা খেলেছে, তুচ্ছ সাময়িক খেলা, প্রেমের উপযুক্ততা তার ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে। মানুষের জীবনে তাই প্রেম আসে একবার, আর আসে না, কারণ

একটি প্রেমই মানুষের যৌবনকে ব্যবহার করে জীর্ণ করে দিয়ে যায়। হৃদয় নামে মানুষের কাব্যে উল্লিখিত একটি যে শতদল আছে, তার বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মে একবারই হয়, তারপর শুরু হয় ঝরে যাবার আয়োজন। সাধারণ হৃদয়, প্রতিভাবানের হৃদয়, সমস্ত হৃদয় এই অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন, কারও বেলা এর অন্যথা নেই।"

অনেকে মানিকবাবুর শিল্পক্ষমতার ক্রমাবনতির মূলে তাঁর কোন এক বামপন্থী রাজনৈতিক দলবিশেষে যোগদানকে কারণ স্বরূপ উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এটি নিতান্তই বহিরঙ্গের বিচার, এ দিয়ে কোন প্রতিভাবান শিল্পীর মানসিক ঊর্ধ্বগতি কিংবা অধোগতির রহস্য বোঝা যায় না, বোঝবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। শিল্পীর মন এরূপ বাইরের কারণকে আশ্রয় করে বাঁধা পথে অগ্রসর হয় না, তাঁর মনের গতি সূক্ষ্ম অন্তর্লোকের লীলার অধীন। লোকচক্ষুর অগোচর সেই গুহাহিত লোকে কিসে যে কী হয়, তা অন্যে তো দূরে থাক্, স্বয়ং শিল্পীও জানতে পারেন না। রাজনীতি শিল্পীর জীবনে নিতান্তই বাহ্য একটি ব্যাপার। আমরা সামাজিক বিচারে যেমন কেউ ব্রাহ্মণ কেউ বৈদ্য কেউ কায়স্থ অথচ আমাদের কর্মজীবনের উপর এই বিভেদগুলির প্রভাব সামান্যই, তেমনই রাজনীতি মানুষের জীবনের উপরকার একটি লেবেল মাত্র। ওই লেবেলের সাহায্যে শিল্পীর পরিচয় নিতে যাওয়া ভুল। যাঁরা মানিকবাবুর ক্রমিক অপকর্ষের মূলে রাজনৈতিক হেতু ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না তাঁরা মানিকবাবুর সমালোচনার নামে রাজনৈতিক দলবিশেষেরই সমালোচনা করেন এবং এতদ্বারা ওই দলের প্রতি স্বীয় চিত্তের সঞ্জাগন বিমুখতাই প্রদর্শন করেন মাত্র। উক্ত দলবিশেষের প্রতি আমাদের যত প্রতিকূল মনোভাবই থাকুক, অবান্তর প্রসঙ্গের দ্বারা সাহিত্যের বিচারকে ভারাক্রান্ত করবার যুক্তি সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়। শিল্পী-সাহিত্যিকের মনকে যদি এমন ভাসা-ভাসা ভাবে স্পর্শ করে তার অন্তর্নিহিত অতলতার সন্ধান পাওয়া যেত তা হলে আর ল্যাঠা ছিল না।

যা হোক, মানিকবাবুর দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তনের রহস্য আমি যেটুকু এবং যতদূর বুঝতে পেরেছি তা এবারে পাঠকদের সামনে নিবেদন করবার চেষ্টা করব। প্রথম কথা হচ্ছে, মানিকবাবু ছিলেন সর্বশ্রেণীর দুর্গত শোষিত জনমানবের অকৃত্রিম বন্ধু। খেটে-খাওয়া সাধারণ মেহনতী মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতিতে কোন খাদ ছিল না। তিনি যথার্থই শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর অবস্থার উন্নয়ন চেয়েছিলেন এবং ওই কাজে স্বীয় সাহিত্য-সৃষ্টিকে ব্যবহার করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। এ কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ফল নয়, যে-কোন

অন্যায়-অসহিষ্ণু ন্যায়পরায়ণ হৃদয়বান শিল্পীর এই ধর্ম। হৃদয়ের সম্পদে ধনী শিল্পী সর্বদেশে সর্বকালে অত্যাচারিত শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এসেছেন, মানিকবাবুও তাই করেছিলেন। সুবিধাভোগী সমাজের মানুষের প্রতি তাঁর নিরন্তর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পিছনে সর্বদাই উঁকি দিয়ে গেছে গরিবের দুঃখে দুঃখী ব্যথাকাতর একটি দরদী হৃদয়। ওই হৃদয়কে আমি আমার সশ্রদ্ধ নতি জানাই। কিন্তু যে দরদ ছিল তাঁর শিল্পজীবনের সবচেয়ে বড় পুঁজি, সেই দরদের আতিশয্যই তাঁর বিচার-বিবেচনায় বিভ্রাট ঘটাল। বিচার বিকারে দাঁড়াল। ভুল করে তিনি ভেবে বসলেন, অন্যায়-অবিচার-শোষণ ও হিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজের নগ্ন, গলিত রূপটিকে পরিস্ফুট করে তোলাই বর্তমান অসম-সমাজ-ব্যবস্থার অবসানের শ্রেষ্ঠ উপায়। যেন সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের ভূমিকা তৈরির কাজটি একক কোন সাহিত্য-শিল্পীর উপর ন্যস্ত আছে এবং সেই একক শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়! কিন্তু ওভাবে কি সমাজের কাঠামো বদলানো যায়, না, সাহিত্যিক তা বদলাতে পারেন? আদর্শবাদের আতিশয্য-পীড়িত মানিকবাবুর মনে এ কথা একবারও কেন জাগল না যে, সমাজের যেমন একটা পচনশীল গলিত দিক আছে তেমনই একটা সদর্থক দিকও আছে? মানুষের মন শুধু অশুভের সমন্বয়েই তৈরি নয়, শুভের প্রভাবও তার উপর কম গভীর নয়। তা যদি না হত, সভ্যতার অগ্রগতির কোন অর্থই থাকত না। অশুভের অভিব্যক্তিসমূহকে অবদমিত, নিয়ন্ত্রিত, সম্ভবস্থলে নিরাকৃত করতে করতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় স্বভাবের সদ্‌বৃত্তিসমূহকে স্ফুটতর করতে করতেই সভ্যতা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলেছে। একচক্ষু হরিণের মত যে শিল্পী শুধুমাত্র জীবনের কদর্যতার উপর তাঁর মনোযোগ স্থাপন করেন তিনি সৎ, আদর্শবাদী, মানবপ্রেমী হয়েও তাঁর সাহিত্যকে খণ্ডিত করেন, অংশতঃ স্বীয় জীবনকেও খণ্ডিত করেন।

শেষোক্ত কথার প্রমাণ মানিকবাবুর নিজেরই জীবন। তিনি যে শিল্প-বিশ্বাসের দ্বারা নিজেকে চালিত করেছিলেন সেই বিশ্বাসের ছিদ্রপথে তাঁর জীবনে ঘনিয়ে এসেছিল ট্র্যাজিডি। সমাজের অসুন্দর দিকের উপর মনোযোগ সংহত করার এবং মানুষের মনকে চিরে-ফেঁড়ে তছনছ করে বিশ্লেষণ করার যে অভ্যাস দুরারোগ্য ব্যাধির মত তাঁকে পেয়ে বসেছিল সেই একমুখী অসুস্থ আবিষ্টতার (obsession) মানসিক ভার তিনি সইতে পারেন নি, ভেঙে পড়েছিলেন। মানিকবাবু যেমন ছিলেন দুঃখী-দুর্গতের অকৃত্রিম সুহৃদ, তেমনই তিনি জনজীবনের স্বার্থের বিরোধী প্রচণ্ড এক অস্বাভাবিক প্রবণতারও

পরিপোষক ছিলেন। এই দুই বিপরীত মনোবৃত্তি একে আরকে কর্তন করেছিল। মানিক-সাহিত্যে এক বিসদৃশ যোগাযোগ ঘটেছিল—প্রগতিশীল সাহিত্যভাবনার সঙ্গে বিকারগ্রস্ত অসুস্থ ভাবনার যোগ। বলা প্রয়োজন, এই অস্বাভাবিক যোগাযোগের জন্যই মানিকবাবুর প্রগতিশীলতা গভীর আন্তরিকতামণ্ডিত হয়েও পুরোপুরি ফলপ্রসূ হতে পারে নি। তিনি উদারমুক্ত ডান হাতে মানবপ্রীতির যে সঞ্চয় উজাড় করে ঢেলে দিতে চেয়েছেন, বিকারের উত্তেজনায় কম্পিত বাম-হাতে তাকে আবার অনেকখানি প্রত্যাহরণও করে নিয়েছেন। 'মর্বিড' সাহিত্য যে গণ-সাহিত্য নয়, তা যে শেষ অবধি জনগণকে বিপথে চালিত করে—গণ-সাহিত্যের একজন উৎসাহী উদ্‌গাতা হয়েও মানিকবাবু এ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি, আমাদের আক্ষেপ সেইখানে। নইলে মানিকবাবুর মত সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্পূর্ণ স্বকীয়তায় মণ্ডিত চিন্তারীতির প্রকাশক লেখক আমাদের সাহিত্যে আর কে আছেন? মানিকবাবুর দোষেরও যেমন তুলনা নেই, তেমনই তাঁর শক্তিরও তুলনা নেই। এমন জটিল মনন আর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির অধিকারী কথাসাহিত্যিক পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যেও খুব বেশী আছেন বলে আমাদের মনে হয় না। কিন্তু লেখকের আত্যন্তিক রিয়ালিজমের বাতিকই তাঁর হিতে-বিপরীত ঘটিয়েছিল। তাঁর চোখে জীবনের বাস্তব আর সাহিত্যের বাস্তবের সীমারেখা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পাপপুণ্যের মিশ্রিত চিত্রণই হল খাঁটি জীবনের চিত্রণ—এই মনোভাবের বশে পাপের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি সুন্দরের দিকে এমনভাবে পিঠ দিয়েছিলেন যে, পরে চেষ্টা করেও আর সুন্দরকে তেমন করে আবাহন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি অসুন্দরের প্রেমে বাঁধা পড়েছিলেন। জনকল্যাণের সদিচ্ছা সত্ত্বেও অসুন্দরকে নিয়ে খেলা করা যে কত বিপজ্জনক মানিক-সাহিত্য আর মানিক-ব্যক্তিত্বই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

৪

আটাশ বছরের সাহিত্যিক জীবনে মানিকবাবু কিছু কম লেখেন নি। হিসাব করলে দেখা যায়, বছরে তিনি গড়ে দুখানা করে বই লিখেছিলেন। মানিকবাবুর জীবনে যতটুকু শৃঙ্খলা ও নিয়ম ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সৃষ্টির প্রাচুর্য একটু বিস্ময়করই মনে হয়। তাঁর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে কোন পরিকল্পনা ছিল না। লিখেছেন তিনি প্রচুর, কিন্তু তাঁর সেই প্রাচুর্যের মধ্যে ভঙ্গীর একঘেয়েমি ছিল—তাঁর সুপরিচিত শোধনাতীত মনোবিশ্লেষণের ঢঙটি সেই একঘেয়েমি এনে দিয়েছিল। ভাষারীতির সংস্কার ও পরিমার্জনের সমস্যা নিয়ে

তিনি চিন্তা করেন নি, আঙ্গিকের প্রশ্নেও তাঁর মাথাব্যথার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, সাহিত্যিক জীবনের সাফল্য আর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অধিকতর সুশিক্ষিত করে তোলার আত্ম-আরোপিত অবশ্য-প্রয়োজনীয় কর্তব্য কী এক দুর্জ্ঞেয় আলস্যহেতু তিনি বরাবর শিকায় তুলে রেখেছেন, পুঁথি-কেতাবে সন্নিবদ্ধ পরের ভাবনা ভাবার চাইতে নিজের ভাবনা ভাবতেই তিনি সমধিক অভ্যস্ত ছিলেন। এই অভ্যাসের ভালমন্দ দ্বিবিধ ফলই তাঁর সাহিত্যে বর্তিয়েছিল—তিনি অত্যাশ্চর্য রকমের মৌলিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে ঐতিহ্যাশ্রয়ী রচনারীতির আমেজ না থাকায় তা কিছু পরিমাণে উৎকেন্দ্রিকও ছিল। পূর্বেই বলেছি, তাঁর ভাষায় সুষমা ছিল না। গোড়ায় যেটুকু বা ছিল, আদাজল খেয়ে 'মর্বিড' সাহিত্যসৃষ্টির হাঁফ-ধরানো কাজে নিয়োজিত হওয়ার পর থেকে তাও অন্তর্হিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের পীড়নে ভুগে এবং ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে তাঁর মনের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিনি শেষের দিকে ভাষার উপর ন্যূনতম প্রভুত্বও হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর কিছু-কিছু প্রবন্ধ-জাতীয় রচনায় তিনি এমন এলোমেলো ভাষা ব্যবহার করেছেন যে, একটি অভ্যস্ত নিপুণ লেখনীর এই দুর্গতি দেখে মনে বিস্ময়ের উদয় হয়েছে। কিন্তু যিনিই মানিকের সাহিত্যিক জীবনের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করেছেন এবং তাঁর মানসিক কেন্দ্রবিচ্যুতির কিছু-কিছু খবর রাখেন, তাঁর নিকট এই দুর্গতি ক্ষোভের কারণ হলেও বিস্ময়ের কারণ হবে না। অতিরিক্ত খুঁটিনাটি-সচেতন সন্দেহাকুল মনোভঙ্গীর এই পরিণামই স্বাভাবিক। পরিণামটিকে আরও বেশী ত্বরান্বিত করেছিল লেখকের নিঃসঙ্কোচ দেহবাদ ও কট্টর বাস্তববিলাস।

মানিক-সাহিত্যের আত্যন্তিক মনোবিশ্লেষণ-প্রবণতার আর একটি অবাঞ্ছনীয় পরিণাম হয়েছে এই যে, যেসকল মূল্যবোধকে আমরা যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধা করে এসেছি, চিরন্তন ভারতীয় চেতনায় যেসকল মূল্যমান অপরিবর্তনীয় ও চূড়ান্ত জ্ঞানে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে গেছে, মানিকবাবু তাঁর খুঁটিনাটি-পরায়ণ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি ফেলে তাদের অনেকগুলির মূল্যবত্তায় ও সার্থকতায় সন্দেহ রোপণ করবার চেষ্টা করেছেন। মানুষের প্রাণের চেয়েও প্রিয় ধারণাবিশ্বাসগুলিকে ব্যঙ্গ করতে পারলে যেন আর তিনি কিছু চাইতেন না। শ্রদ্ধেয়কে অশ্রদ্ধেয় প্রমাণ করতে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক স্বভাবের উল্লাস ছিল। দয়া তাঁর নিকট কিছু নয়, কতকগুলি রসনিঃসারী স্নায়ুর ক্রিয়ার পরিণামফল মাত্র ; প্রেম বয়ঃসন্ধিকালের ফাঁপা মনোবিলাস ('দিবারাত্রির কাব্যে'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য) ; সাধারণের ধর্মবিশ্বাস

একটা অভ্যাসপুষ্ট গতানুগতিক সংস্কার বই কিছু নয় ('অহিংসা'), ইত্যাদি। কোথায় মানিকবাবুর গণতান্ত্রিক চেতনা মানবীয় সভ্যতায় যা-কিছু সুন্দর ও মহৎ তাকে তুলে ধরবে, তা নয়, শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বের উগ্র জিগির তুলে তিনি সেইসব সদ্বৃত্তিগুলিকেই আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন ! মানিক-সাহিত্যের এই স্বতোবিরোধ—ঘোষিত আদর্শ ও কার্যপদ্ধতিতে অসামঞ্জস্য—সেই সাহিত্যের অনেকখানি মূল্যাপকর্ষ ঘটিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে সত্যই মহান্ ও গরীয়ান্ শিল্পী, সেখানে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি এই অর্থে বাংলা সাহিত্যের সার্থকতম রিয়ালিস্ট শিল্পী যে, সমসাময়িক কালের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীজীবনের ট্রাজিডি এত নির্মম সত্যনিষ্ঠা ও শিল্পকুশলতার সঙ্গে আর কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। নিম্নবিত্ত ও সর্বহারা সমাজের ক্ষয় ক্ষতি মনুষ্যত্বের অপচয় হতাশা ও গভীর বিষাদ তাঁর লেখনীতে মর্মান্তিক অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। তাঁর "প্রাগৈতিহাসিক", "ফিরিওয়ালা", "বউ" পর্যায়ের গল্প, "লজ্জা" প্রভৃতি রচনা লেখকের অসাধারণ বাস্তবমুখী দৃষ্টির সাক্ষ্য দিচ্ছে। শেষের দিকের রচনায় অত্যাচারী ও শোষক সমাজের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম-চেতনার রূপক একাধিক গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে, এই-জাতীয় গল্পগুলির মধ্যে "হারানের নাতজামাই", "মাসিপিসি", "ছোট-বকুলপুরের যাত্রী", তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা।

কিন্তু এত বাহ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্যিকারের মহত্ত্ব তাঁর স্বভাব-সুলভ চিন্তাশীলতায়, প্রজ্ঞায়, দার্শনিকতায়। তাঁর ওই সহজাত দার্শনিকতার সঙ্গে শিল্পদৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছিল। এই দার্শনিকতা একান্ত আক্ষরিক অর্থেই সহজাত ছিল। পুঁথি-কেতাব থেকে দার্শনিকতার শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন নি, ভারতের সনাতন দার্শনিক ধ্যান-ধারণাগুলির প্রতিও যে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল তা বলা চলে না, তিনি দার্শনিক ছিলেন তাঁর স্বভাবের গভীর তাগিদের বশে, এ ক্ষেত্রে বহিঃপ্রভাবের প্ররোচনা ছিল সামান্য। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'ইতিকথার পরের কথা', 'দর্পণ', প্রভৃতি উপন্যাস-গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায়, এই সকল গ্রন্থের লেখক পল্লীজীবনের শুধু বহিরঙ্গের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন না, তার গহন-গূঢ় অন্তর্জীবনেরও সংবাদ রাখতেন। 'অহিংসা' মর্বিড দেহবিলাসী বই হলেও তাতেও এই অন্তঃসঞ্চরণ-শীলতার ছাপ আছে। লেখকের স্বাভাবিক প্রজ্ঞা এ ব্যাপারে তাঁর সহায় হয়েছিল। পল্লী-কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের প্রশ্ন-সমস্যার আলোচনার ফাঁকে

ফাঁকে তাদের মুখের কথায় এমন সব গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সংলাপ মাঝে মাঝে ঝিলকিয়ে উঠেছে, যা একান্ত মনোসন্ধানী প্রাজ্ঞ লেখকের লেখনীমুখেই শুধু প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। আমাদের ভারতবর্ষের পল্লীর মানুষের জীবনস্রোত চলে দুই ধারায়। সমান্তরাল তাদের গতি। এক ধারা হল প্রাত্যহিক জীবনের শতবিধ খুঁটিনাটির মধ্যে জীবিকানির্বাহের জন্য বেঁচে থাকা আর এক ধারা হল এই জীবন সংগ্রামেরই পাশে পাশে সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর অগোচরে চিন্তা-কল্পনাময় একটি সূক্ষ্ম জীবন যাপন করা। পল্লী-কৃষকের জীবনে এই দুই ধারায় কখনও সংঘাত হয় না। পল্লীকেন্দ্রিক উপন্যাসের অতি সাধারণ পাত্র-পাত্রীর মুখেও লেখক প্রায়শঃ এমন সব গূঢ় অর্থব্যঞ্জক ভাবগাঢ় কথা বসিয়েছেন, যা সাধারণ প্রতীতিতে একমাত্র প্রাজ্ঞ দার্শনিকের মুখেই উচ্চারিত হওয়া সম্ভব। স্বকীয় প্রতিভার লক্ষণচিহ্নমণ্ডিত দার্শনিক উক্তিতে লেখকের পাত্রপাত্রীসমূহের কথা ভরপুর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লীজীবনের বাহ্য এবং গূঢ় এই দুই জগতের বার্তাই জানতেন। বাইরের জগৎ অপেক্ষা মনের জগতে ঘোরাফেরা করাতেই তাঁর স্বচ্ছন্দতা ছিল বেশী। তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণের লেখাতেও সহজ এই প্রজ্ঞা যথেষ্ট মাত্রায় আছে, তবে তাঁদের মনন জটিলতা-কুটিলতা-সমাচ্ছন্ন নয়। কুটিল চিন্তায় প্রথম নামীয় লেখকদ্বয়ের বিশেষ কোন উৎসাহ নেই—বিভূতিভূষণের তো একেবারেই নয়। কিন্তু দোষ হোক গুণ হোক এইটেই ছিল মানিক-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী তিন প্রকৃষ্ট ঔপন্যাসিকের মধ্যে মানিকের মৌলিকতাই সবচেয়ে বেশী।

মানিকবাবু গত হয়েছেন। তাঁর জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা থেকে এ কালের লেখকদের অনেক কিছু শেখবার আছে। তিনি শিখিয়েছেন, সাহিত্যে গভীর নিষ্ঠা থাকলে লেখক তাঁর সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের বিফলতা সত্ত্বেও সমাজের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নিতে জানেন। মানিকবাবু সাহিত্যের জন্য সর্বপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন বলেই তাঁর রচনায় এমন গভীরতা এসেছিল এবং পাঠকমনের উপর তাঁর প্রভাব এতদূর ব্যাপ্ত হয়েছিল। এমন কি ব্যবসায়বুদ্ধিসার প্রকাশক-সম্প্রদায়ও তাঁর শক্তিমত্তা আর আদর্শবাদকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেন নি। দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষা, শক্তির সঞ্চয় যতই অপরিমিত হোক তা কেন্দ্রচ্যুত হলে অচিরেই তা নিঃশেষিত হয়ে আসতে বাধ্য। শৃঙ্খলা সংযম নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ শুধু নিছক সুনীতি-হিসাবেই অনুশীলনযোগ্য নয়, শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ এবং স্থায়িত্বের জন্যও ওই গুণগুলি প্রয়োজন। এ সকল গুণের অনুশীলন মানিকবাবু করেন নি, নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

পরিশিষ্ট—২

মানিক-জীবনের প্রধান প্রধান তথ্য

জন্ম: ১৯ মে, ১৯০৮ (৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ বঙ্গাব্দ)

জন্মস্থান: দুমকা, সাঁওতাল পরগণা।

পিতা: হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাতা: নীরদাসুন্দরী দেবী।

পৈতৃক নিবাস: মালপদিয়া, বিক্রমপুর, ঢাকা।

মাতুলালয়: গাওদিয়া, বিক্রমপুর, ঢাকা।

পারিবারিক বৃত্তান্ত: হরিহর ছিলেন চোদ্দটি সন্তানের জনক—আট পুত্র, ছয় কন্যা। মানিক ভায়েদের মধ্যে পঞ্চম।

স্কুলশিক্ষা: পিতা ছিলেন সেটেলমেণ্ট বিভাগের কানুনগো, বদলীর চাকরি। তাই মানিকের বাল্য ও কৈশোর শিক্ষা স্থান থেকে স্থানান্তরে সম্পন্ন হয়। টাঙ্গাইল, মহিষাদল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মেদিনীপুর ইত্যাকার নানা জায়গায় তাঁর স্কুলের লেখাপড়া চলে। শিক্ষারম্ভ কলকাতার মিত্র ইনষ্টিট্যুশনে। ম্যাট্রিক পাশ করেন মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে।

কলেজীয় শিক্ষা: বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ন ক্রীশ্চিয়ান কলেজ। এখান থেকে ১৯২৮ সালে আই. এস. সি. পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর গণিতে অনার্স নিয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। মানিক মনোযোগী ছাত্র ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির বক্র কটাক্ষপাতের ফলে অচিরে শিক্ষাজীবন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সাহিত্যসেবাতেই তদগতচিত্ত হন। তাঁর আর বি. এস. সি. পাশ করা হয়নি।

সাহিত্যে যাত্রারম্ভ: প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়া কালে বন্ধুদের সঙ্গে বাজী রেখে মানিক 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে একটি গল্প পাঠান। গল্পের নাম "অতসী মাসী"। গল্পটি বাজী জিতল অর্থাৎ পত্রিকায় ছাপা হল। শুধু তাই নয়, বিচিত্রা-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় গল্পটির জন্য পনের টাকা দক্ষিণা পাঠিয়ে আরও গল্পের ফরমায়েস করলেন। সেই থেকে মানিকের কলেজের পাঠে মন্দা দেখা দিল। দিনরাত লেখার কাজেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'মানিক' তাঁর আসল নাম নয়—ডাকনাম। আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মানিক নামটাই তাঁর লেখক-সত্তার সঙ্গে লেপ্টে গেল।

গর্কির "গর্কি" ছদ্মনামের তলায় "পেশকভ" নামটি লোপ পাওয়ার মত মানিক নামের আড়ালে প্রবোধকুমার নামটিও মুছে গেল।

সাহিত্য রচনার প্রস্তুতিকাল: ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪।

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ: জননী (উপন্যাস, ১৯৩৫) ও গল্পসংগ্রহ অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫)।

রচনাবলী: এরপর ক্রমান্বয়ে বহু সংখ্যক ছোটগল্প সংকলন ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়। গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে বিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী, সরীসৃপ, বৌ, সমুদ্রের স্বাদ, ভেজাল, আজ কাল পরশুর গল্প, মাটির মাশুল, ফেরিওয়ালা, ছোট বকুলপুরের যাত্রী ও অন্যান্য গল্প, ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ উপন্যাস—দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, অমৃতস্য পুত্রাঃ, সহরতলী ২ খণ্ড, অহিংসা, দর্পণ, চিহ্ন, স্বাধীনতার স্বাদ, সোনার চেয়ে দামী, ২ খণ্ড, পাশাপাশি, ইতিকথার পরের কথা, সার্বজনীন, আরোগ্য, শুভাশুভ, হরফ, পরাধীন, প্রেম, মাশুল, ইত্যাদি।

রচনার পরিমাণ: সব মিলিয়ে প্রায় ষাটখানা গ্রন্থ। কমবেশী তিনদশক কাল জুড়ে লেখক জীবনের বিস্তৃতি (১৯২৮-১৯৫৬)। মানিকের সংগ্রামশীল অনিশ্চিত জীবন, অস্বাস্থ্য, রোগজীর্ণতা, নেশার উদভ্রান্তি ও নিয়মরাহিত্য বিবেচনা করলে সৃষ্টির পরিমাণ কিছু কম বলা যায় না।

বিবাহ: ডিসেম্বর ১৯৩৭। সহধর্মিণীর নাম: শ্রীমতী কমলা দেবী।

মৃগীরোগের আক্রমণ: ১৯৩৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। ইতিমধ্যে ছ-সাতখানা বই লেখা হয়ে গেছে। লেখার কাজে অত্যধিক পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির ফলে সম্ভবতঃ মৃগীরোগের সূত্রপাত। মৃগীরোগের চিকিৎসায় বহু ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছেন কিন্তু তেমন কোন সুফল পাননি। অবশেষে ব্যর্থতার মনস্তাপে মরিয়া হয়ে নিজের চিকিৎসা নিজেই চালাতে আরম্ভ করেন। আগেও মদ্যাসক্তি ছিল—এখন মদের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলেন। আর কী আশ্চর্য! ওই সুরাপানের অভ্যাসের জন্যই কিনা কে জানে রোগের তীব্রতা অনেকটা প্রশমিত হল। সুরাপানের এই আপাত-সুফলটাই শেষ পর্যন্ত মানিকের কাল হল। মৃগীরোগ সেরে গেল বটে কিন্তু সুরাসক্তি কালান্তক ব্যাধির মত মানিককে আমৃত্যু রাহুর মত তাড়া করে ফিরল ও তাঁর স্বাস্থ্য সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত করে দিল।

কর্মজীবন: ১৯৩৭-৩৮ দু-বছর 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক। ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারি কাজে ইস্তফা। এই একই সময়ে কিছুকাল ভাইয়ের

সঙ্গে মিলে প্রকাশন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ। প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গে একটি ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠা করেন। একটি মাসিকপত্র বার করারও পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবেও এ কাজে পুরো সময় দিতে না পারায় দু বছরের মাথাতেই ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হয়।

যুদ্ধের শুরুতে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টে প্রচার দপ্তরে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালের মে-জুন পর্যন্ত তিনি এই চাকরিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই কাজ করতে থাকাকালে নানাবিধ মূল্যবান বাস্তব অভিজ্ঞতার দরুণ তিনি মার্কসবাদী জীবনদর্শনের প্রভাব-বৃত্তের মধ্যে এসে পড়েন।

মার্কসবাদে দীক্ষা: মার্কসবাদে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা ১৯৪৪ সালে। এই সময় থেকে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিরও সংস্রবে এসে পড়েন।

রচনার ধারার পরিবর্তন: মার্কসবাদী প্রত্যয়ের প্রভাব-বলয়ের মধ্যে আসার পর থেকে তাঁর শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটে। ফ্রয়েডীয় যৌনতার আতিশয্য তাঁর লেখার সীমানা থেকে ক্রমশঃ কমবেশী অপসৃত হয়। তবে পুরনো অভ্যাস কখনও কখনও ওই পর্বেও আত্মপ্রকাশ করে রচনার মানাবনতি ঘটায়। দৃষ্টান্ত: চতুষ্কোণ উপন্যাস (১৯৪৮)।

সাংস্কৃতিক যোগাযোগ: প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ, ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সঙ্ঘ, সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি, আই. পি. টি. এ, প্রভৃতি। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে রামমোহন হলে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সঙ্ঘের প্রেসিডিয়ামেও ছিলেন।

বাসস্থান: গোড়ায় ছিলেন টালীগঞ্জের পৈতৃক আবাসে ভাইয়েদের যৌথ সংসারে। পরে জ্যেষ্ঠাগ্রজ উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারী ডক্টর সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস. সি., পি. আর. এস., ডি. এস. সি. (আলীপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা) এর প্রত্যক্ষ অভিভাবকত্ব থেকে নিজেকে ছিন্ন করে সপরিবারে বরানগর আলমবাজার অঞ্চলের নিতান্ত সাদামাঠা ভাড়াটে বাড়ীতে উঠে আসেন। এই মূলতঃ শ্রমিক ও কারিগর-অধ্যুষিত অঞ্চলেই শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন।

অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা কিন্তু অন্য পুত্রদের তত্ত্বাবধানে থাকা অপেক্ষা এই দৃশ্যতঃ গরীব ছেলের সঙ্গে থাকতেই বেশী পছন্দ করতেন এবং তাঁরই ডেরাকে জীবনের শেষ আশ্রয় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। পিতৃস্নেহের বৈচিত্র্যের এ এক তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন।

স্বীকৃতি : জীবৎকালেই দেশে-বিদেশে রচনার সমাদর। ইংরেজীতে, রুশ ভাষায়, চেক ভাষায় একাধিক বইয়ের অনুবাদ-সংস্করণ প্রকাশ।

ব্যাধির প্রকোপ : ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ সাল এই চার বছর প্রায় সবটা সময়ই প্রচণ্ড রোগ ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করে লেখার কাজ চালাতে হয়। অসুখ বৃদ্ধি পেলে একটা সময় ইসলামিয়া হাসপাতালে ও লুম্বিনি মানসিক আবাসালয়ে চিকিৎসিত হন। সরকারী অর্থানুকূল্য ও বিশিষ্ট গুণীজনদের বদান্যতা চিকিৎসার ব্যয়নির্বাহে কার্যকর সহায় হয়ে ওঠে।

মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬।